পনেরই আগস্টের গল্প

আসাদ বিন হাফিজ

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন

www.pathagar.com

পনরই আগষ্টের গল্প
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশিকা
কামরুন্নেছা মাকসুদা
প্রীতি প্রকাশন
১৯১ বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
প্রথমপ্রকাশ
আশ্বিন ১৩৯৭
রবিউল আউয়াল ১৪১১
সেপ্টেম্বর ১৯৯০
প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
হামিদুল ইসলাম
মোমিন উদ্দীন খালেদ
বুলবুল সরওয়ার
মুদ্রণ
পেপার কনভার্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
৯৯ মতিঝিল বা/এ , ঢাকা-১০০০
দাম
সাদা ৩০.০০
নিউজ ২০.০০
ডলার ২.০০

PANARAI AGOSTER GALPA
BY: ASAD BIN HAFIZ
PUBLISHED BY
KAMRUNNASA MAKSUDA
PREETI PROKASHON
191, BARA MAGABAZZAR
DHAKA-1217
PUBLISHED ON
SEPTEMBER 1990
COVER DESING & ILLUSTRATION
HAMIDUL ISLAM
MOMIN UDDIN KHALED
BULBUL SARWAR
PRINTED AT
PAPER CONVERTING & PACKAGING LTD.
99 MOTIJHIL C/A DHAKA-1000
PRICE
TK. 30.00 (WHITE)
TK. 20.00 (NEWES)
$ 2.00

www.pathagar.com

সূচীপত্র

জাহান্নামের চৌরাস্তা
বইছে নদী
রাধা বিরহিনী
আশ্রয়
জায়ন পাহাড়ের ডাক
বিদ্রোহী
পনরই আগষ্টের গল্প

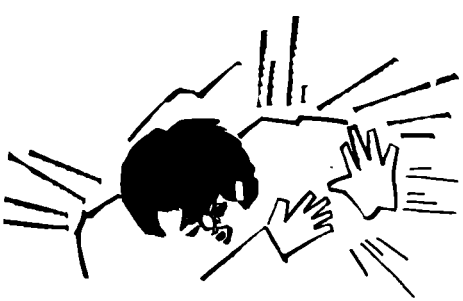

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

কি দেখো দাঁড়িয়ে একা সুহাসিনী ভোর (কাব্য)
ভাষা আন্দোলন ও ডান-বাম রাজনীতি (প্রবন্ধ)
হরফ নিয়ে ছড়া (শিশু সাহিত্য)
আলোর হাসি ফুলের গান (শিশু সাহিত্য)

www.pathagar.com

পরণে জিন্সের প্যান্ট আর গেঞ্জি। উত্তেজক ভঙ্গিতে মেয়েটি বসেছিল রিক্সায়। চায়না বিল্ডিংয়ের গলিতে যখন ঢুকতে যাবো তখন চোখাচোখি হয়ে গেল। জিরাফের মত বাড়িয়ে দেয়া গলা দেখে বুঝা গেল কারো জন্য অপেক্ষা করছে সে। ছিপছিপে একহারা গড়ন। আরেকটু লম্বা হলে বায়োনিক ওম্যান বলে চালিয়ে দেয়া যেতো। চোখে মাছ রাঙ্গার সন্ধানী দৃষ্টি। আবছা আলো আঁধারিতে গলির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল রিক্সাটা। আশে পাশে আরো কয়েকটি খালি রিক্সা। প্যাসেঞ্জার ছিল না বলে সিটের ওপর বসে খোশগল্প করছিল রিক্সায়ালারা। পাশের পান সিগারেটের দোকানের সামনে দু'একজনকে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। অনেকগুলো চোখ সার্চ লাইটের মত মেয়েটির দিকে নিবদ্ধ। তো, এনিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যথা ছিল না। ঢাকাতে হরহামেশাই এমনটি চোখে পড়ে। লোকগুলোর মধ্যে থেকে কে একজন একটা সরস মন্তব্য ছুঁড়ে মারল। এগিয়ে যেতে যেতে মন্তব্যটা কানে আসে আমাদের। মুকুল আর সইতে না পেরে বলে উঠলঃ 'শুনলি, শুনলি?'

রিক্সাওয়ালাদের এই সরস মন্তব্যে মেয়েটির কি প্রতিক্রিয়া হলো বুঝা গেল না। রিক্সা থেকে নামতে নামতে বললামঃ 'জাহান্নামের চৌরাস্তা' বাহ্, বেশ জুৎসই মন্তব্য তো! কানের ভেতর অকস্মাৎ হাজারটা গ্রামোফোন বেজে উঠলঃ জাহান্নামের চৌরাস্তা, জাহান্নামের চৌরাস্তা। ঘাবড়ে গেলাম। আস্তে আস্তে ভলিউম বাড়তে থাকলো গ্রামোফোনের। জোরে, আরো জোরে। একটানা একটা সুরই কেবল বাজতে থাকলো কানের ভেতর। সেই তীব্র চিৎকারে মনে হলো কানের পর্দাটা ফেটে যাবে। দু'পাশ থেকে আংগুল ঠেসে ধরলাম। এবার মগজের ভেতর শুনতে পেলাম সেই চিৎকার। সেকি বিকট বিশ্রী চিৎকার। সামনে পা বাড়ালাম। মনে হলো পিছনে হাজার হাজার জনতা তারস্বরে চিৎকার করছেঃ জাহান্নামের চৌরাস্তা! জাহান্নামের চৌরাস্তা! মহা ফ্যাসাদে পড়লাম।

www.pathagar.com

ক্রমে চিৎকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। চারদিকে সেই রিক্সাওয়ালার মুখ আর সেই চিৎকার। লোহার গেটটা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ক্যাচ করে উঠল গেটটা। মনে হল সেও চিৎকার করে বলছেঃ জাহান্নামের চৌরাস্তা। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে থাকলাম। আওয়াজ হলোঃ জাহান্নামের চৌরাস্তা। কখন তিন তলায় উঠে গেছি টের পাইনি। কলিং বেল টিপে ধরলাম। শুনতে পেলাম সেই একই শব্দ, একই সুর।

ভেতরে ঢুকে রেজা ভাইকে খুঁজলাম। কোথাও পাওয়া গেল না। আনোয়ার ভাইয়ের সাথে দেখা হলো। ঃ 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন' বলতে বলতে তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলাম আমরাও। আবার সেই গলির মাথা। আগুনের জিহ্বার মত টকটকে সেই নারী। অসামান্য রূপসী। হেলেন হেলেন বলে যুবকেরা চিৎকার করে উঠল। শহরের প্রায় প্রতিটি ফটক হাট করে খোলা। মনে হলো রিক্সা থেকে এখনি হাজার হাজার হেলেন ছড়িয়ে পড়বে পুরো শহরে। তারপর খোলা ফটক দিয়ে ঢুকে যাবে অন্দরে।

আমরা এখন রাজপথ দিয়ে হাঁটছি। প্রতিটি চৌরাস্তায় দেখতে পেলাম অসংখ্য, অগণিত হেলেন। শহরের প্রতিটি জানালা দিয়ে দেখা যেতে থাকলো হেলেন, ক্লিউপেটরা আর মোনালিসার মুখ। সেভেলের চটর চটর আওয়াজ শুনে মনে হলোঃ জাহান্নামের চৌরাস্তা। জাহান্নামের চৌরাস্তা! বলে চিৎকার করছে সেভেল।

রাজপথের ধুলা উড়লো বাতাসে। ছড়িয়ে পড়লো গালে, মুখে, সারা শরীরে। শুনতে পেলাম সেই চিৎকার।

আমরা শহর ছেড়ে বাইরে যাবার রাস্তা খুঁজলাম। গলির মুখ থেকে সোজা পশ্চিম দিকে চলে গেছে যে পথ সে পথেই আমরা এগুতে থাকলাম। তখন মনে হল আমরা ট্রয় নগরী ছেড়ে পালাচ্ছি।

আজিমপুর কবরস্থানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম কবর থেকে বহু লাশ উঠে এসেছে। কেউ কেউ পালাচ্ছে আমাদের মত। অনেকে আবার ছুটছে শহরের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে নবাবগঞ্জ পেরিয়ে আমরা বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে দাঁড়ালাম। তারপর কখন কিভাবে বুড়িগঙ্গা পার হয়েছি বুঝতেই পারিনি। যখন হুঁশ হলো, দেখতে পেলাম সোহাগী নরম মাটির উপর আমাদের পা।

পেছনে তাকালাম। দেখলাম ধোয়ার কুন্ডলী পাঁক খেয়ে খেয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। জ্বলছে ট্রয়। জ্বলছে প্রগতির সাধের হেলেন। জ্বলছে সোফাসেট, বেড কভার আর অভিশপ্ত রাজার প্রাসাদ। আমরা প্রভুর শোকরিয়া আদায় করলাম। ধন্যবাদ দিলাম সেই রিক্সাওয়ালাকে। তারপর লজ্জাবতী লতা খুঁজতে খুঁজতে ছড়িয়ে পড়লাম বাংলাদেশের মানচিত্র জুড়ে।

www.pathagar.com

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। শীতের তুহীন রাত। জোস্না ধোয়া হিম হিম ঠান্ডা বাতাস। অসময়ে অমন বৃষ্টিপাত বিচ্ছিরি লাগে। কয়েকটা অকথ্য গালি ছুড়ে মারে সাগর বাতাসের গায়ে। পকেটের শেষ সিগ্রেটটায় আগুন ধরায়। একবার চোখ বুলায় হাত ঘড়িটার দিকে। একটু এগিয়ে দোকান থেকে আরেক পেকেট সিগ্রেট নেয়। আবার নেমে আসে রাস্তায়।

বানের পানির মতো মানুষের মিছিলটা মিইয়ে আসে। ফাঁকা ফাঁকা রাজপথ। ঠিক যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা বিরহীর বুক। মাঝে মধ্যে দু'চারটি স্মৃতি হেঁটে যায় নিঃশব্দে। কালো চাঁদরে আবৃত শরীরটা চেনা যায় না। শুধু অনুভূত হয় দুঃস্বপ্নের চপল হাঁটা। দু একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে পাশ কেটে দৌড়ে যায়। এগিয়ে চলে সাগর।

ঘড়ির দিকে তাকায়। সাড়ে দশটা। তার মানে কবীর কমপক্ষে ঘন্টা দেড়েক আগে বেরিয়ে পড়েছে। সাগর পায়ের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। উঠে আসে রেল সড়কের হিমেল পাতে। কাঁচা ঘুম থেকে জেগে ওঠা চোখের মতো ঝাপসা দৃষ্টি লাইট পোস্টের ফ্যাকাশে চোখে। রেল সড়কের পাথর বনে গড়িয়ে পড়ে গাঢ় কুয়াশার দল। শাজাহানপুর রেল ক্রসিংয়ের ওখানে একজন রেল কর্মচারীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। বোধ হয় বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেসের আগমন প্রতীক্ষায়।

সাগর ভ্রুক্ষেপ করে না। এগিয়ে যায়।

সাগর হাঁটে। বাতাস ভারী হয়।

সাগর হাঁটে। পদে পদে জমে উঠে পাপ।

ক্রমে শ্লথ হয়ে আসে তার পায়ের গতি। এক সময় থামে।

খট্ খট্ খট্–তিনটে টোকা। খট্ করে খুলে যায় একটা বন্ধ দুয়ার।

তারপর সব অন্ধকার।

www.pathagar.com

খসখস শব্দ তুলে এগিয়ে চলে কবীরের বলপেন। একটা ছবির ক্যাপশন লেখে। আরো কয়েকটি নিউজ তুলে নেয় হাতে। অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংবাদ তার সামনে স্তূপ হয়ে আছে।

ঃ উফ্!এখনো অনেক গুলো নিউজ বাকী।

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠে কবীরের। একটা সিগ্রেট ধরায়। আলতোভাবে একটা টান দিয়ে কাত হয়ে কপালের শিরাটায় হাত রাখে। অসম্ভব পরিশ্রম যাচ্ছে কদিন। ভাল্লাগে না। হাঁপিয়ে উঠেছে সে।

মার চিঠি পাবার পর থেকে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেছে। মেহের নাকি দু'টো সন্তান নিয়ে স্বামীর ঘর ভেঙ্গে চলে এসেছে। মা লিখেছে টাকার জন্যে। আহা! আমার উপোসী মা।

ঃ কই, কবীর হলো?–জলীল ভাই তাড়া দেন।

ঃ এ্যা–হ–এই দিচ্ছি।

কবীর আবার ডুবে যায় নিউজের মধ্যে। মতিঝিলে ব্যাঙ্ক লুট, যশোরে আওয়ামী লীগ নেতা খুন, চাটখিলে শিবিরের মিছিল–একের পর এক নিউজ আসতে থাকে। সিদ্ধেশ্বরীতে গৃহবধু অপহৃতা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ–। স্ত্রীর কথা মনে পড়ে কবীরের। মৌসুমী। বাসায় একা। আহা বেচারী! হয়তো এতক্ষণ তার কথাই ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে কবীরের বুক থেকে। মৌসুমী বড় নিঃসঙ্গ। একটা লোক রাখা দরকার ছিল বাসায়।

কিন্তু সিঙ্গেল রুমের বাসা। কাউকে রাখার জো নেই। আর রাখবেই বা কাকে। মাকে এ মুহূর্তে আনা যাবে না। বাড়ীটাতো এখনো মা–ই আগলে রেখেছে। একটা ছোট ভাই যদি থাকতো – আফসোস করে কবীর। অন্তত একটা চিন্তা তাকে ভাবিয়ে তোলে। মার অবর্তমানে বাড়ীটার কি হবে? মৌসুমীকে একা সেখানে রাখা কি ঠিক হবে? নাকি বিক্রি করে দেবে?

ঃ কবীর, দাও দেখি কদ্দুর হলো।

জলীল ভাই হাত বাড়ান। সম্বিত ফিরে পেয়ে কবীর নিউজ কয়টা এগিয়ে দেয়।

টেলিপ্রিন্টারের একটানা আওয়াজ ছাড়া আর সব চুপ চাপ। কবীর উঠে দাঁড়ায়।

ঃ জলীল ভাই, আজ আর পারবো না, শরীরটা বড় খরাপ লাগছে।

কবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে আর না করতে পারেন না টেবিল ইনচার্জ আঃ জলিল। মাফলারটা পেঁচিয়ে বেরিয়ে আসে কবীর। ঠান্ডা–ভীষণ ঠান্ডা পড়েছে আজ।

মতিঝিল–কমলাপুরে অসংখ্য বে–আব্রু মানুষ চিংড়ী মাছের মতো পা–মাথা এক করে শুয়ে আছে। দেখে কবীরের নিজকে বড় অপরাধী মনে হয়। মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে পড়ে।

www.pathagar.com

মনে পড়ে '৭৪ এর দুর্ভিক্ষের কথা। শতশত বেওয়ারিশ লাশের কথা। মুক্তিযুদ্ধের উজ্জল স্বপ্নের সাথে কোথাও মিলানো যায় না একে। এর আসল গলদটা যে কোথায় বুঝা মুস্কিল। অনেক বিড়ম্বনার পর স্বাধীনতা এলো। সবাই প্রত্যাশা করলো একটু শান্তির। অথচ রাজপথে এখন লাশের গন্ধে হাঁটা যায় না। অনেক নতুন কথা শোনা গেল। কিন্তু কমলাপুর স্টেশনের দিগম্বর লাশগুলো আর সজীব হলোনা।

–ধ্যাৎ, কি সব ভবছে কবীর। যত্তোসব রাজনীতি–ফাজনীতির চিন্তা। যেন ডুবে গিয়েছিল কোথাও। একটা মালগাড়ী সিটি মারে। সিগ্রেট ধরায় কবীর। কমলাপুর স্টেশনটা পার হয়ে রেল লাইন ধরে হাঁটতে থাকে।

হাঁটতে হাঁটতে আগামী কালের কাজের এটা খসড়া তৈরী করে। নাস্তা সেরে বাজার। তারপর যাবে একটু সাগরের ওখানে। কিছু টাকা ধার পাওয়া যায় কিনা দেখবে। সাগরের কথা মনে হতেই কৃতজ্ঞতায় তার মনটা ভরে উঠে। চমৎকার ছেলে। এ পর্যন্ত সে যা করেছে কবীরের জন্য সোদ্দর ভাইও এতটুকু করেনা। কবীরের মনে হয় সাগরের হৃদয়টা ঠিক সাগরের মতো। অসংখ্য নদী তাতে লীন হয়ে যেতে পারে অনায়াসে।

কবীর ঘড়ি দেখে। তিনটে বেজে তিন মিনিট। দরোজায় নক করতে যেয়ে অনুভব করে দরজাটা ভেজানো। আঁৎকে উঠে সে। চুরি হলো নাতো? নাকি ভুলে দরজা না দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে মৌসুমী। ডাক দেয়ঃ মৌসুমী। তারপর দরজা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে। এগিয়ে গিয়ে নিজেই অন করে দেয় সুইচ। ততক্ষণে উঠে বসে মৌসুমী –সাগর। ধক করে জ্বলে ওঠে কবীরের চোখ দুটো। পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত শরীরটা এগিয়ে যায় খাটের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়ে সাগরের ওপর। কিন্তু অবসন্ন শরীরটা পেরে উঠে না। মুখ থুবরে পড়ে যায় কবীর। অজ্ঞান দেহটা লুটিয়ে পড়ে মেঝের উপর।

এ ঘটনার পর থেকে কবীর সম্পূর্ণ বদলে যায়। নিজের উপর অবিশ্বাস ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। ঘর থেকে বের হয়নি দুদিন। অফিসে যায়নি। একটা প্রতিশোধ স্পৃহা তাকে দারুন আক্রোশী করে তোলে। কি সব অদ্ভুত চিন্তা ও স্বপ্নে কেটে যায় দিন দুটো। পরদিন তাকে দেখা যায় মোস্তা কোবরেজের আস্তানায়। ঘন্টা দুই আলাপ হয়। ফিরে এসে সারাদিন বাসায় বুদ হয়ে বসে থাকে। সিগ্রেটের পর সিগ্রেট টানে। মদ খায়। রাতে আবার বাইরে বেরোয়। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় শ্মশান ঘাটার দিকে। সাপের হিসহিসানির মতো শীতের কনকনে ঠান্ডা বাতাসে হাত পা অবশ হয়ে আসে। মোস্তা কোবরেজ বলেছেঃ রাত ১২টার পর নেংটা হয়ে শ্মশান ঘাটার মাটি আনতে হবে। সেই মাটিতে অষুধ হবে। পাগল হয়ে যাবে মৌসুমী ও সাগর।

এ ব্যাপারটাই সারাদিন ভেবেছে সে। শ্মশান ঘাটার অনেক লোমহর্ষক কাহিনী শুনেছে

www.pathagar.com

ছোট বেলায়। কেমন ভয় ভয় লাগে। কিছুই বুঝতে পারে না কী করবে। মৌসুমী পাগলিনী হবে জন্মের মতো–কেমন চিনচিন করে উঠে অন্তরটা। সে কি এখনো ভালোবাসে মৌসুমীকে? বুঝতে পারে না। বিয়ের পরের দিনগুলির কথা মনে পড়ে। কল্পনায় ভেসে উঠে একের পর এক সে সব মধুময় স্মৃতি। বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। চোখ দু'টো ভিজে আসে। কান্না পায় কবীরের।

কবীর আর এগোয় না, ফিরে আসে বাসায়। কি করবে ভাবে। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। একটা সিগ্রেট ধরায়। শরীরটা এলিয়ে দেয় খাটের ওপর। দেয়ালের দিকে চোখ যায়। একটা ছবি। পাশাপাশি বসে আছে মৌসুমী ও কবীর । অনেক্ষন তাকিয়ে থাকে। মৌসুমীর মুখে হাসি । যেন বিদ্রুপ করছে কবীরকে। মুখটা ঘুরিয়ে নেয় সে। চোখ বন্ধ করে ভাবতে থাকে। বিক্ষিপ্ত এলোমেলো চিন্তা। অনেক টুকরো ছবি।

আব্বার কথা মনে পড়ে কবীরের । সেই দরবেশ দরবেশ মানুষটি। কী প্রশান্ত ও গম্ভীর মুখ। প্রথম দিকে আব্বা তেমন কিছু বলতেন না। কিন্তু বুঝা যেত বন্ধুদের নিয়ে ঘরে আড্ডা দেয়াটা আব্বা পছন্দ করেন না। কিছুদিন গেলে এ নিয়ে মাকে নানা কথা বলতেন। মা বলতেন আমাকে। মাঝে মাঝে উষ্মা প্রকাশ পেতো মার কথায়।

ঃ তোর বন্ধুদের আড্ডায় বৌমাকে না জড়ালে কি হয় না? নতুন বউয়ের সথে বেগানা পুরুষের এত কি আলাপ। তোর আব্বা কিন্তু এসব মোটেই পছন্দ করেন না।

মার এসব সেকেলে কথা খারাপ লাগতো। বলতাম ঃ সাগর আমার বন্ধু। তাকে তোমরা বেগানা পুরুষ দেখলে কই?

শেষ দিকে এসব নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটি হতো। সাগর পার্টি করতো। বললামঃ তোর লিডারকে ধরে ঢাকায় একটা চাকুরী ঠিক করে দে'না।

তার মাসখানেক পরেই পত্রিকার এ কাজটি পাওয়া গেল। কিছু দিন গেলে মাকে বলে মৌসুমীকেও ঢাকায় নিয়ে আসা হলো। আজ হঠাৎ করেই অনেক দিন পর আব্বার প্রতি একটা অন্ধ আবেগ ও শ্রদ্ধা অনুভব করে কবীর। বিছানা থেকে উঠে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় বাথরুমের দিকে। অজু করে। তারপর আব্বার মৃত্যুর পর এই প্রথম নিরিবিলি জায়নামাজে দাঁড়ায়। দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে। গভীর নিষ্ঠা নিয়ে হাত দু'টো মেলে ধরে আকাশের দিকে। কবীরের চোখ থেকে তখন সবার অলক্ষ্যে দু'টো অশ্রুর নদী বয়ে যেতে থাকলো।

বইছে নদী। দুকুল ছাপিয়ে যেন বন্যা হচ্ছে। আর তাতে ভেসে যাচ্ছে পাপের কালিমা।

www.pathagar.com

রাধা বিরহিণী

উদাস হাওয়া গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বাঁশের ঝাড়ে। আঘাতের ঝাপটা সইতে না পেরে বাঁশ ঝাড়ের মাথাটা নীচে নুয়ে আসে। ছটফট করে। কাঁপে। যেন মুঠোয় চেপে ধরা কোন জীয়ল মাছ, ছুটে পালানোর জন্য ছটফট করছে।

বাঁশ ঝাড়ের মাথার ওপর ঝুলে আছে পুরনো চাঁদ। আলোহীন। নিষ্প্রভ। কান্না ভেজা নারীর চোখের মত। ঘোলাঘোলা। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে হতাশা। হু-হু বাতাসে বেদনার সুর বাঁশপাতার শিরশির শব্দে করুণ কান্নার অবিচ্ছিন্ন রোদন ধ্বনি। বাঁশঝাড়ের একটু পূবে আলো আঁধারীতে শুয়েছিল যে বাড়িটা তার জানালায় একটি মুখ। মুখটা এক যুবতীর। উদাস চোখ দুটো তার দিগন্ত বিস্তৃত শূন্য চরাচরে অসীম নির্লিপ্ততায় থমকে আছে। দূর থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট গানের সুর। অস্পষ্ট কিন্তু বাঙময়। গানের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ছন্দ যে তার মুখস্ত। তার বুক চিড়ে মুখ ফসকে অস্ফুটে বেরিয়ে এলঃ 'গোপাল! গোপাল! কানু আমার! কানাই আমার! তোর বাঁশী থামা, কান্না থামা, আমি যে আর সইতে পারিনা।'

বাঁশী থামেনা। গান থামেনা। থামেনা সুরের করুণ বিলাপ। নিশীথের নিস্তব্ধতা খান খান করে অঝোর ধারায় ঝরে পড়ে সে সুর। বিরহী হৃদয় তোলপাড় করে সে সুর ছড়িয়ে পড়ে ব্যপ্ত চরাচরে। কেঁদে ওঠে মন। কেমন করে ভুলবে সে কানুর পিরিতি। মন মানেনা তার। ছুটে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে ঐ বুকে। বন্দী পাখির মতন ছটফট করে সে। কেন

www.pathagar.com

এমন হল? ভরা যৌবন নিয়ে আমার গোপাল কেন উন্মাদ হল ভগবান! আমায় কেনে মরণ দাওনা তুমি নাথ।'

কাঁদতে কাঁদতে তার চোখের জল ফুরিয়ে গিয়েছিল। মুখের ভূভাগে মরা গাঙের আশাহীন শুকনো জলের রেখা। শাড়ির আঁচল তার মাটিতে লুটায়। খোলা চুল বাতাসে ওড়ে।

রাত আরো গভীর হয়। আরো স্পষ্ট হয় বাঁশীর মোহন সুর। সুরের তালে তালে বাড়ে বুকের রক্তক্ষরণ। হাক সে পাগল। কিন্তু আমারই তো দেবতা সে। আমি যাব তার কাছে। প্রতিরাতেই এমন ভাবনা এসে হানা দেয় মনে। কোন কোন দিন সে তার টিনের সুটকেসটা খোলে। সুটকেস থেকে বের করে হাতে নেয় প্রিয় সিঁদুরের কৌটাটা। দেখে। মুঠোয় পুরে জোড়হাতে কপালে ঠেকায়! 'দেবতা আমার, আমার শ্যাম — একবার,শুধু একবার তোমার হাতে আমার কপালে দাও একফোঁটা সিঁদুর। একবার আমার নারী জন্মটা সার্থক কর।'

কিন্তু বাতাসে হারিয়ে যায় তার সকরুণ ধ্বনি। শুকিয়ে যায় তার পূজার ফুল। সবকিছু ছাপিয়ে ব্যাপ্ত চরাচরে গুমরে মরে শুধু এক সুর, এক গানঃ

পদ্মার ঢেউ রে

মোর শুন্য হৃদয় পদ্মে নিয়ে যা যারে—

একদিন এ গানের জন্য চাতকের মত অধীর হতো সে। কিন্তু আজ? আজ হৃদয় উজার করা সে গান তীরের মত বিদ্ধ করে হৃদয়। একদিন তার এ আবেগ মথিত সুরের কাঁপন জেলে পাড়ার একঘেয়ে নিরানন্দ জীবনে জাগাতো অদ্ভুত শিহরণ। জেলেপাড়ার পরিশ্রমী মানুষদের হৃদয়ে ঢেউ তুলে সে সুর মিলিয়ে যেতো দূর দিগন্তে। বাতাসে ভেসে বেড়াতো সে সুরের মূর্ছনা পদ্মার ঢেউরে— —।

কান পেতে শুনতো সে এ গান। গান গাইতে গাইতে চরের সীমানা ভেঙে গোপাল যখন উঠে আসতো পাড়ার কাঁচা রাস্তায় আর গুনগুন সুর ভাজতে ভাজতে চলে যেতো ঘরের দিকে--কতদিন সে দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকেছে সে। ওর বুক জুড়ে খেলা করতো ফুরফুরে সুখ। দুর থেকে জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রনাম করতো সে মনের মানুষটিকে। সে সব দিনের স্মৃতি কত না সুখের। কত না আনন্দের। ভীষণ বেগে ছুটে আসতো পদ্মার জল। আসতো বর্ষা। আসতো চকচকে ইলিশের ঝাঁক। রূপোলী ইলিশ দিতো রূপোর টাকা। জেলে পাড়ার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়তো সুখের বাতাস।

সে বছর এমনি দিনে ওদের মনেও ডেকেছিল খুশীর বান। তার মনে পড়ে, সেদিনও আকাশে ছিল অস্পষ্ট চাঁদের আলো। গুনগুন গান গেয়ে ঘরে ফিরছিল গোপাল। সন্ধ্যে বাতি জ্বালিয়ে দাওয়ায় বসেছিল ওরা। উঠোনে জলচৌকিতে বসেছিলেন তার বাপ নিতাই মন্ডল।

www.pathagar.com

গোপালের গলার স্বর শুনে গলা খাকারি দিয়ে ডেকে উঠেছিলেন তিনিঃ 'কেডা, গোপাল নাকি রে?'

গান থামিয়ে গোপাল এসে দাঁড়িয়েছিল পাশটিতে।

ঃ 'হ খুড়ো।'

ঃ 'গাঙের থেকা আইলা বুঝি?'

ঃ 'জল কি বাড়তেছে?'

ঃ 'হ খুড়ো, আইজ একটু বাড়ছে।'

ঃ 'আইচ্ছা।' অস্ফুট একটু আওয়াজ করে চুপ করে গিয়েছিলেন তিনি। আবছা অন্ধকারে ঘরের কোণায় দাঁড়িয়েছিল সে। যাবার বেলায় ফিসফিস করে বলেছিল গোপাল ঃ 'ভগবানের আর্শিবাদ মাগ বধূয়া। লক্ষ্মীর কৃপা হলে আর বেশীদিন তর একলা থাকন লাগব না। দেখিস এইবার ঠিক তর লাইগা একটা ঘর তুইলা ফালামু।'

সে কোন কথা বলতে পারেনি। লাজ রাঙা মুখটা নিয়ে দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়েছিল।

পাড়ার শুরুতেই বাড়িটা ওদের। নিতাই মন্ডল শুধু তার বাপই না পাড়ারও বড়কর্তা। বয়েস হয়েছে বুড়োর। আজকাল গাঙে খুব কমই যান তিনি। তার দুই ছেলে গোরাই আর বলাই এখন তাগড়া জোয়ান। গেল সনে ছোট ছেলে বলাইয়ের বিয়ে দেয়ার পর সংসার বুঝিয়ে দিয়েছেন ওদের হাতে। ঘরে এখন শুধু এক কন্যা। তার বিয়েটা হলেই বুড়োর দুনিয়ার ঝামেলা চুকে। একটু শান্তিতে মরার আশায় বুড়ো তাই একটা ভাল বর তালাশ করছে মনে মনে। ছেলে হিসেবে গোপাল মন্দ না। ছেলেটাকে তাই মনে ধরেছিল বুড়োর। একে ছেলের সুঠাম স্বাস্থ্য আর সুন্দর গলা; তার ওপর যেমনি ভদ্র তেমনি নম্র। আর বুড়োকে সবচেয়ে আকর্ষণ করে ওর বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ।

গোপালকে যে বাবা স্নেহ করেন সে কথাটা সে বুঝেছিল আরো অনেক আগেই। যেদিন বুঝেছিল সেদিন থেকেই গোপালকে সে মনে করতো তার দেবতা।

প্রিয়ার ছুটে পালানোর দৃশ্যটা বুকে গেঁথে গোপাল পা বাড়িয়েছিল ঘরের দিকে। পাড়াটা ওদের ছোট। সব মিলে পঞ্চাশ বায়ান্ন ঘর। গোপালদের ঘরটা পাড়ার উত্তর সীমানার একটু আগে। রাস্তাটা ছিল ভেজা ভেজা। পরেশদের ঘরের কাছে আসতেই কলাগাছের অন্ধকারে পরে পাটা ওর ডুবে গিয়েছিল কাদায়। আরো দুটো ঘর পার হয়ে সুশীলদের চালের নীচ দিয়ে মাথা গলিয়ে উঠোনে উঠে এল গোপাল। দেখলো চাটাইর উপর বসে বিড়ি টানছেন বাবা।

www.pathagar.com

ঃ 'বাবা, গাঙের পানি বাড়তেছে।' একটা তরল আনন্দ ঝরে পড়লো গোপালের ঠোঁট থেকে।

ঃ 'জাল ডা তো অহনো কিনা অইলো না। কাইল না সোনাতলার হাট? যা কাইলই জালডা কিনা ফালাইতে অইবো।'

পা ধুয়ে ঘরে ঢুকলো গোপাল। কমলা দেবী পাত এগিয়ে দিলেন ছেলের সামনে। খেয়ে দেয়ে তেল চিটচিটে বালিশ আর ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে শুয়ে পড়েছিল সে। বালিশের তলায় ম্যাচটা রেখে কুপিটা নিভিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুবোধ বালকের মত। সে রাতেই সে দেখেছিল অদ্ভুত স্বপ্নটা।— হাত ধরাধরি করে ওরা গিয়ে পৌঁছল এক বিজন প্রান্তরে। হঠাৎ কী হলো, হাত ছেড়ে দিয়ে গোপাল দ্রুত পালাতে লাগলো। সে যতই তাকে ধরতে যায় ততই আরো দূরে সরে যায় সে। এভাবেই নাকি গোপাল পালিয়ে গিয়েছিল। স্বপ্নটা শুনে হেসে উঠেছিল রাধা ঃ 'বুঝছি, তোমার আর তর সইছে না। আমারে পাওনের লাইগ্যা এক্কেবারে পাগল অইয়া উঠছো তুমি।'

বধুয়ার কথায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছিল গোপালের মনের ভয়। সীমাহীন আশা নিয়ে গোপাল নতুন একটা জাল কিনেছিল। তারপর খুব যত্নের সাথে তাতে সে রশি বাঁধল। কাঠি লাগালো। গাবের কষে ভিজিয়ে রোদ্রে শুকালো। তারপর বাপের সাথে গাঙে ভাসিয়ে দিল তরী।

তখন আষাঢ়ের প্রথম প্রহর। এই একটা সময় যখন পদ্মাপাড়ের এ মানুষগুলোর সুখের কোন থই পাওয়া যায় না। পদ্মার ঢেউয়ে ঢেউয়ে তখন দেখা দেয় যৌবনের উচ্ছল মাতামাতি। ফুলে ফেঁপে জল এসে লাফিয়ে উঠে দাওয়ায়। পদ্মাপাড়ের জেলেদের জীবনে দেখা দেয় নতুন প্রাণের স্পন্দন। দিনরাত ঘুম নেই। কেমন এক মাদকতাময় নেশায় মেতে উঠে সবাই। যেন দুরন্ত পদ্মার জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ডেকে ফিরছে ঃ 'ওরে আয়, আয়, আয়— —।' পদ্মার এ আহবান যেন ওরা কেউ এড়াতে পারে না। নৌকা নিয়ে ছুটে যায় পদ্মার বিশাল বুকে। দিন গিয়ে কখন রাত নামে আর রাত শেষে আসে দিনের আলো সে খেয়াল রাখারও যেন ফুরসত নেই কারো। এমনি সময়ে গোপাল শুনলো সে খুশীর খবরটা।

সেদিন প্রায় ভোর রাতের দিকে বাড়ি ফিরে এসেছিল গোপাল। সারারাত মাছ ধরেছে গাঙের বুকে। ঘুমোতে পারেনি একতিল। বাড়ি ফিরে যেই পরিশ্রান্ত পিঠটা বিছনায় ঠেকিয়েছে অমনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সে। গঞ্জের মহাজনের হাতে মাছগুলো তুলি দিয়ে গোপালের বাপ যখন ঘরে ফিরল তখনো ঘুম ভাঙেনি ওর। গোপালকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে ধীরেন বাবু ডাক দিলেন ঃ 'গোপাল, অ গোপাল। কত ঘুমাস? উঠ উঠ।'

www.pathagar.com

ডাক শুনে গোপালের ঘুম ভাঙলো ঠিকই কিন্তু রাজ্যের আলসেমী পেয়ে বসল ওকে। চোখ না খুলে তাই যেমন শুয়েছিল তেমনি শুয়ে রইল সে।

জলের ঘটি এগিয়ে দিলেন কমলা দেবী। হাতমুখ ধয়ে খেতে বসলো গোপালের বাপ। গোপালকে ঘুমে দেখে খেতে বসেই কথা উঠাল ধীরেন।

ঃ 'হুন্‌ছস কমলা, বড় কর্তার লগে দেহা অইছিল পথে। কর্তা কইল ধীরেন নাকিরে, মাছ কিমুন পড়তাছে এইবার? কইলাম– আপ্‌নের আশীর্বাদ কর্তা, বছরডা এইবার ভালই মনে অইতাছে। তারপর একথা সেকথার পর জিগাইল — গোপালের বিয়ার কথা চিন্তা করলা কিছু? কইলাম — তেমন কিছু ভাবি নাই এহনও। তয় এ ব্যাপারে আপনার হুকুম আছে কিছু? কর্তা কইল — না ধীরেন, হুকুম না। তয় পোলা বিয়ার লায়েক অইছে, বিয়াতো করাইতেই অইবো। এহন থিকাই চিন্তা–ভাবনা করা দরকার না?'

ঃ 'পোলাতো আপনারই কর্তা। ভালমন্দ এবার আপনি চিন্তা করবেন।' কর্তা কইল না, ধীরেন, আমার একলার চিন্তায় তো আর কাম অইবো না। তয় আমার বিটিরে ধারে কাছে রাখতে পারলে বুড়া বয়েসটা একটু আরামে কাটতো। তুমি এহন যাও, চিন্তা ভাবনা কর। পরে দেহা কই র আমার লগে।'

ঃ 'কি কও! বড় কর্তা নিজের মুহে কইছে এই কথা?' কমলা অবাক না হয়ে পারল না। 'ওর মতন মাইয়া দেবতাদের ঘরেই বা কয়টা আছে? অমন মেয়ে পাওয়াতো সাত পুরুষের পুণ্যির জোর।' ওরা যখন এসব বলাবলি করছিল গোপাল তখন চুপচাপ শুনছিল সব। খাওয়া শেষে বিড়ি ধরিয়ে ধীরেন বাইরে গেলে গোপালকে ডেকে তুলেছিলেন কমলা দেবী। ঃ 'উঠ বাবা, মুখ ধুইয়া আয়, ভাত খাবি।'

মায়ের ডাক শুনে যেন এইমাত্র ঘুম ভাঙল এমনি একটা ভাব নিয়ে উঠে বসেছিল গোপাল। তারপর চারটে মুখে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল সেও।

দরিদ্র বলেই জেলেদের জীবনে সহনশীলতাটা একটু বেশি। সুখে দুঃখে একাত্ম হয়ে ওরা দিন কাটায়। তদুপরি এই ছোট্ট পাড়ায় কারো মুখ থেকে একটা কথা বেরুলে মুহূর্তে জানাজানি হয়ে যায় সর্বত্র। গোপালের বিয়ের সম্বন্ধের খবরটাও এ কান সে কান করতে করতে সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ধীরেনের সাথে এ নিয়ে বড় কর্তার বিস্তারিত আলাপ হলো। ধীরেন বলল ঃ 'কয়টা দিন সময় দিতে হবে কর্তা। একটা ছাপড়া তুলতে না পারলে পোলা বউ রাখবো কোথায়?' শেষে ওরা ঠিক করলো, এবারের মৌসুমটা পার হলেই লগ্ন দেখে কাজটা সমাধা করে ফেলবে।

www.pathagar.com

সেই থেকে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে যাচ্ছিল গোপাল। একটা নতুন ঘর তুলতে হবে তার। এজন্য টাকার দরকার। অনেক টাকা। সারাটা রাত তাই গোপালের নদীতে থাকতে হচ্ছিল। বাড়ি ফেরার পথে কোন কোন দিন দেখা হয়ে যেত বড় কর্তার সাথে। পথের দিকে তাকিয়ে থাকতো রাধা। গোপালকে আসতে দেখলেই এটা ওটা ছল করে গোপালের দৃষ্টিতে একটা ঝিলিক তুলে সরে পড়তো। তার তখন খুব ইচ্ছে করত গোপালের পাশটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ভালমন্দ জিজ্ঞেস করে। বলে ঃ 'গোপালদা, একটু জিরাইয়া যাও। দুটো সন্দেশ মুখে পুরে একটু জল খেয়ে যাও অন্ততঃ।' কিন্তু কিছুই বলা হয় না তার। একরাশ লজ্জা এসে ওর সব কথার মুখ যেন বন্ধ করে দেয়।

আজ দুদিন ধরে মেঘলা আকাশ। হালকা হাওয়ার সাথে ইলশেগুড়ি বৃষ্টির মাতামাতি। পদ্মার চেহারা এখন রুদ্র ভয়ংকর। জলে প্রচন্ড স্রোত। চারদিকে ঘোলা জলের ক্রুদ্ধ নাচন। এ সময়ই মাছ ধরা পড়ে বেশি। ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ সুড়ুৎ করে ঢুকে যায় জালের ভেতর। কখনো কখনো ঝাঁক এতো বড় হয় যে নৌকায় আর টেনে তোলার উপায় থাকে না।

খুব সাবধানে জাল টানছিল গোপাল। সুশীল ছিল পাশের নৌকায়। হঠাৎ কী হলো, সুশীলদের নৌকাটা কাত হয়ে গেল। পলকে জালের রশি কেটে দিল সুশীল। পদ্মার ঢেউয়ে হারিয়ে গেল সুশীলদের জালটা। নতুন জালের জন্য সুশীল বাড়িতে যাবে, গোপল বলল ঃ 'খাড়া, আমিও যাবো।'

সামান্য বেলা থাকতেই নদীর পথ ধরলো গোপাল। এখন খাটাখাটুনির চিহ্নমাত্র নেই মুখে। সেখানে এখন তৃপ্তিকর প্রশান্ত হাসি। মাথায় ছোট করে ছাটা চুল। বড় জিয়ল মাছের পিঠের মত কালো শরীরে পড়ন্ত সূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। স্নানের পর গায়ে নারকেলের তেল দিয়েছিল। মাছের আঁশটে গন্ধের সাথে নারকেল তেলের সে ঘ্রাণ মিশে কেমন মাদকতাময় একটা ঘ্রাণ বেরুচ্ছে শরীর থেকে। মরা চেউমাছের মত খোলা পিঠের ওপর একটা আধ ভেজা গামছা। অঞ্জুর সাথে গল্প করছিল রাধা। গুনগুন একটা আওয়াজ শুনে দু'বান্ধবীই বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখ রাখলো বাইরে। দেখলো চার আঙ্গুল দূর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে গোপাল। সখীর পিঠে চিমটি কাটলো অঞ্জু।

ঃ 'কিরে ডাকবো দেবতাকে?'

ঃ 'পূজা দেওন লাগলে ডাক।'

ঃ 'বারে, আমি পূজা দিতে যামু ক্যান? ও তো তোর দেবতা।'

কী জবাব দেবে রাধা ভেবে পায়না কিছু।

ঃ 'দেখ, ফাজলামী করিছ না কিন্তু। বালা অইব না কইতাছি।' বলেই দুই সখী সরল হাসিতে মেতে ওঠে। এমনি অনেক টুকরো স্মৃতি, অনেক টুকরো ঘটনা জমা হয়ে আছে

www.pathagar.com

তার বুকে। এসব স্মৃতি যত মনে পড়ে ততই বুকটা হাহাকার করে ওঠে। কী এক অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে কেঁদে ওঠে প্রাণ।

ঃ 'কানু আমার, কানাই আমার, ফিরে আয় তুই ফিরে আয়।' আবার বলে ঃ 'হ্যারে কানু, একবারও কি আমার কথা মনে হয়না তোর। একদিন তুইতো বলেছিলি, তোরে ছাড়া বাঁচবোনা, সব ভুলে গেলি? মনে করে দেখ সেদিন সন্ধ্যে বেলা আয়েশ করে বিড়ি টানতে টানতে গাঙে যাচ্ছিলি তুই। যাচ্ছিলি আর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলি আমাদের উঠোনোর দিকে। নারকেল গাছের অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। ডাকলাম — গাপালদা। ডাক শুনে প্রথমটায় তুই চমকে উঠেছিলি। আমাকে দেখতে পেয়ে বললি — আরে! তুই এখানে? এখানে কি করতাছস? চোখে মুখে তোর বিস্ময়ের ছটা। আমার হৃদয় উজার করা ভালবাসা সেদিন তুলে দিয়েছিলাম তোর হাতে। কোচড় থেকে পুটলিটা বের করে তোকে দিয়ে বলেছিলাম — রাইতে যখন ভুক লাগে তহন খাইও। পোটলাটা হাতে নিতে নিতে বলেছিলি–এতে কি আছেরে? তারপর নিজেই পোটলার মুখ খুইলা কইলি — বাহ্ চমৎকার। তুই নিজের হাতে বানাইছস? সেই সন্দেশ তো আর সন্দেশ ছিলনা; শ্যাম, সে যে ছিল আমার প্রেম। সেই সন্দেশের দানা হাতে সেদিন কেন বলেছিলি — তরে ছাড়া আমি বাচুমনা। কেন বলেছিলি — তুই আমার জীবন, আর কয়টা দিন সবুর কর লক্ষ্মী আমার।'.

গোপাল আমার, দেবতা আমার, আর কতকাল আমি অপেক্ষা করব, কতকাল আর চাতকের মতন তাকিয়ে থাকব উদাস চরাচরে?

শুধু মনে পড়ে, বর্ষাটা শুরু হয়েই শেষ হয়ে গিয়েছিল সে বছর। কোত্থেকে যে কী হলো কিছুই বুঝা গেল না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল জল কমছে পদ্মার। কমছে তো কমছেই। ব্যাপার কি? চারদিকে গুঞ্জন উঠলো। কপালে করাঘাত করতে করতে ঘরে ফিরল জেলের দল। জেলে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়লো হতাশার বিষাক্ত থাবা। একটা অজানা শঙ্কা আর ভীতি ছড়িয়ে পড়লো আসছে দিনগুলোর ভয়াবহতার কথা ভেবে। কেউ কেউ বলল ঃ 'কোন্ রাক্ষুসী নাকি বাঁধ দিয়েছে গাঙের মধ্যে।' বাপের জন্মে এমন কথা কেউ শোনেনি। তাই কথাটা কেউ বিশ্বাস করলো কেউ করলো না। প্রবীণেরা কেউ কেউ বললোঃ 'ধেৎ, এইডা একটা বিশ্বাসের কতা অইলো? গাঙের জল, সূর্যের আলো আর পবনের বেগ কি কেউ আটকাইতে পারে?'

পারে কি পারেনা সে বিতর্কে তার কি লাভ। কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক পদ্মার জল তো কমলই কেবল। শুকোতে শুকোতে গলা জল, হাটু জল হতে হতে একদিন দেখা গেল সাদা বালু চিকচিক করছে পদ্মার পেটে। তারপর কী যে হলো। দেখতে দেখতে

www.pathagar.com

তছনছ হয়ে গেল পাড়াটা। চোখের জল, নাকের জল একাকার করে কেউ কেউ চলে গেল শহরে। শোক সইতে না পেরে অনেকের মত মরে গেল বুড়ো নিতাই মন্ডল।

হাহাকার করে উঠলো তোর বুক। সেই যে কপাল ফাটল সেই ফাটাটাই দিনে দিনে বড় হচ্ছে। একটা নতুন ঘরের স্বপ্ন দেখেছিল মানুষটা। সেই স্বপ্ন তার পুরল না কোনদিন। শোকে দুঃখে চোখের সামনে মানুষটা পাগল হয়ে গেল। পদ্মার চর, ভাঙা ভিটা, গঞ্জের হাট, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় গোপাল। কখনো কাঁদে, কখনো হাসে, কখনো বাঁশীতে সুর তোলে আগের মতন। কখনো বা গান ধরে পদ্মার ঢেউরে-- --।

এসব দেখে দেখে বুকটা ভেঙে আসে রাধার। কিন্তু কিছুই করা হয় না, কিছুই করতে পারে না সে।

এখনো চরের দিক থেকে ভেসে আসছে গানের সুর। মনের সকল দরদ ঢেলে গাইছে গোপাল — পদ্মার ঢেউ রে-- -- --

জানালা ছেড়ে সরে এলো রাধা। সুটকেস খুলে সিঁদুরের কৌটাটা হাতে নিল পরম যত্নে। তারপর সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সাহস করে খুব সন্তর্পনে চৌকাঠ পেরুল সে। উঠোন পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করলো চরের দিকে।

হাঁটছে রাধা। পায়ের গতি একবার বাড়ছে একবার কমছে। সুরটা আরো বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে। আবছা দেখা যাচ্ছে একটা মানুষের ছায়া। হাঁপড়ের মতন বুকটা লাফাচ্ছে রাধার। তবু এগোল সে। দাঁড়ালো গোপালের পাশটিতে গিয়ে। গান থামিয়ে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো গোপাল। তার চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করলো রাধা। কিন্তু কিছুই ঠাহর করতে পারল না সে। তবু বুকের সমস্ত সাহস একত্রিত করে হাত মেলে ধরলো গোপালের সামনে। কী ভেবে সিঁদুরের কৌটাটা হাতে তুলে নিল গোপাল। উল্টে পাল্টে দেখলো। হঠাৎ কি খেয়াল হলো, কৌটাটা ছুঁড়ে মারল দূরে। খা-খা-খা-খা, ডাইনী বুড়ি খা, খানকি মাগী খা- চিৎকার করতে করতে সে দৌড়ে পালিয়ে গেল দূরে।

দেখতে দেখতে রাধার দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেল গোপাল। বোবার মত দাঁড়িয়ে রইল রাধা। তার চোখ থেকে তখন নেমে এসেছে জলের ধারা। বুক ভিজিয়ে নামছে মাটিতে। রাধার বুকের ভেতর থেকে উথলে উঠা সেই প্রেমের নদীতে ভাসছে পদ্মার চর। ভিজে যাচ্ছে শুকনো বালি। এ স্রোতে কে দেবে বাঁধ? যে বাঁধ ভেঙ্গেছে রাধার হৃদয় এ স্রোতের সামনে কতদিন টিকে থাকবে সে বাঁধ?

www.pathagar.com

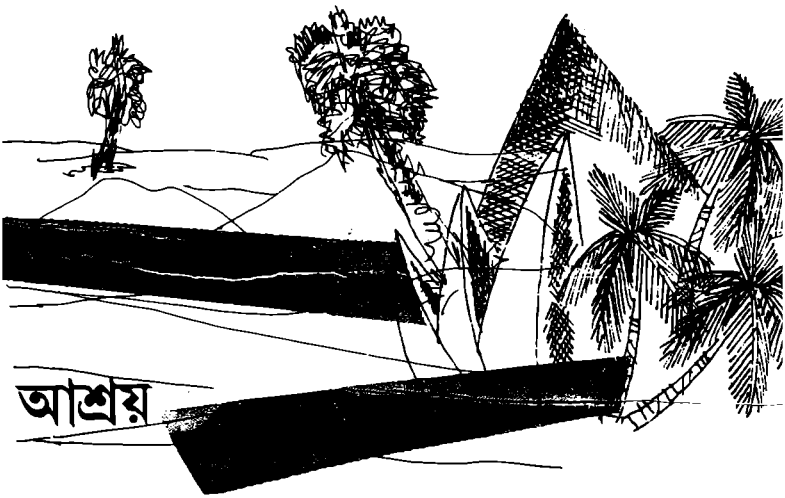

আশ্রয়

মরুদ্যান থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়াল যুবতী দুজন। তাকিয়ে দেখল যুবককে। যুবক দেখল যুবতীদের। পলকের জন্য চোখাচোখি হল। লজ্জাবতী লতার মত দৃষ্টি গুটিয়ে আনল যুবতীরা। নজর ফিরিয়ে নিল যুবকও।

যুবতীদের সাথে একপাল বকরী–ভেড়া। মরুভূমির জেদী সূর্য আগুন বৃষ্টি করছিল তাদের ওপর। হাপাচ্ছিল পশুরা। এক কাতরা পানির লোভে জুলজুল করে তাকাচ্ছিল কূয়োর দিকে। যুবতীদের শ্রান্ত পা আর ক্লান্ত চোখেও বিবি হাজেরার বেকারার পেরেশানী। তবু তারা কূয়োর দিকে এগিয়ে গেলনা, উঠে এলনা মরুদ্যানেও।

নিতান্ত ক্ষুদ্র মরুদ্যানটিতে বসেছিলেন যুবক। রাখালদের বেহায়া দৃষ্টির ছোবল থেকে বাঁচার জন্য এ মরুদ্যানটিই ছিল যুবতীদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। প্রতিদিন এ মরুদ্যানের ছায়ায় বসেই যুবতীরা খুলে দিত ঠোঁটের লাগাম। গল্পে মুখর হয়ে উঠতো উঠতি বয়সের দুই মরুবালা। ভিনদেশী যুবককে দেখে গনগনে সূর্য মাথায় ওরা নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল।

কূয়োর চারপাশে তখন প্রচন্ড ভীড়। কিলবিল করছে অসংখ্য পশু আর রাখাল। বকরী আর ভেড়ার পাল নিয়ে একে একে আসছে রাখালের দল। আসছে আর যাচ্ছে–যাচ্ছে আর আসছে। শবে বরাতের ভিক্ষুকের মত তাদের মিছিল যেন আর ফুরোয়না।

সময় গড়িয়ে যায়। যুবক তাকায় সেই যুবতীর দিকে। যুবতীরা তাকিয়ে দেখে বিষন্ন যুবক। মরদের মত সামর্থ শরীর যুবকের। চোখেমুখে শরাফতের আমেজ। সেনাপতির মত সীনার গড়ন। বাহুতে সৈনিকের শক্তপেশী। কুয়াশার গভীর পর্দা ভেদ করে ভেসে আসা জোসনার মত যুবকের শরীর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে এক ধরনের জ্যোতির দ্যুতি।

www.pathagar.com

যুবক তাকিয়ে দেখে পেরেশান যুবতীদের। তাদের পুষ্পের মত নিষ্পাপ মুখে বেদনার ছাপ। রৌদ্র মাথায় একঠায় দাঁড়িয়ে যুবতীরা। করুণায় আদ্র হন যুবক। উঠে দাঁড়ান তিনি। তারপর সংকোচের জড়তা ঝেড়ে এগিয়ে আসেন যুবতীদের দিকে। পায়ের নীচের বালুর দিকে তাকিয়ে সৌজন্যের পশরা মেলে জানতে চান যুবকঃ "বলুন, আমি কি আপনাদের কোন উপকারে আসতে পারি?'

দূর দিগন্তে উদাস দৃষ্টি রেখে জবাব দেয় যুবতীদের একজন।

ঃ 'ভিনদেশী যুবক এক আপনি জনাব। আমাদের জন্য কেন বেহুদা পেরেশান হবেন!'

যুবতীদের লাজনম্র ব্যবহারে অভিভূত যুবক আবারো জানতে চান তাদের মুসিবতের কথা।

ঃ 'বলুন কোন্ সে বিপাকে পড়ে ছায়াহীন সূর্য মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘ সময় ধরে?'

যুবতীদের উদাস কণ্ঠে বেজে উঠল হতাশার গান।

ঃ 'আমাদের আব্বা হুজুর বড়ই জয়ীফ। বয়সের ভারে নুব্জ দেহ তাঁর। রাখালদের জন্য আমাদের পশুগুলিকে আমরা পানি খাওয়াতে পারিনা। যতক্ষণ রাখালরা তাদের পশুদের পানি খাইয়ে ফিরে না যায় ততক্ষণ আমাদের এভাবেই প্রতীক্ষা করতে হয়।'

যুবক তখন তাঁর সহযোগিতার হাতকে প্রসারিত করে দিল। জন্তুগুলোকে নিয়ে গেল কূয়োর পাশে। পানি খাইয়ে ফিরিয়ে দিল যুবতীদের। শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা জানাল বিনম্র যুবতীদ্বয়। তারপর ফিরে চলল সেখানে– যেখানে তাদের জয়ীফ পিতা তাদের ইন্তেজারে বসে আছেন। যুবতীদের মনে তখন অনেক প্রশ্ন– অনেক চিন্তা। তাদের জিন্দেগীতে এমনটি আর ঘটেনি কোনদিন। কে এই মহান যুবক! ভদ্রতার পশরা সাজিয়ে পরের কল্যাণে যিনি যেঁচে এসে বাড়িয়ে দেন সহযোগিতার উদার হাত।

ভাবতে ভাবতে যুবতীরা এগিয়ে যায়। যেন মরুভূমির নিস্তরঙ্গ বালির সমুদ্রে ভেসে যায় দুই পদ্ম কোরক। যেন মৃদুমন্দ ঢেউয়ের দোলায় নেচে ওঠে দুই পুষ্পকলি।

আর যুবক?

মরুভূমির নির্জন একাকীত্বে ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরে আশ্রয়হীন, নিরাপত্তাহীন পূণ্যবান যুবক দূর দিগন্তে অবসন্ন দৃষ্টি ছড়িয়ে বসে আছেন নির্বিকার। চারদিকে তার সীমাহীন শূণ্যতার মৌতাত। যুবকের কল্পনার ঘোড়া তখন স্বপ্নের মত দ্রুত বেগে ছুটে যায় স্মৃতির পাহাড় ডিঙ্গিয়ে। কত বিচিত্র এ জীবন! শৈশব থেকে কৈশোর–কৈশোর থেকে যৌবনের দীর্ঘ সফরে কত যে চড়াই–উতরাই পেরিয়ে এসেছেন তিনি — ভাবতে গেলে অবাক লাগে।

বড় এক মর্মান্তিককালে তার জন্ম হয়েছিল। মিশরের মাটিতে তখন দুঃসময়ের ঝড় বইছে। বনি ইসরাঈলের প্রতিটি ঘর তখন কাঁপছে সে ঝড়ে। একতিল নিরাপত্তার আশ্বাস

www.pathagar.com

নেই কোথাও। দাজ্জাল এক বাদশাহ তখন মিশরের তখতে। তিনি শুধু বাদশাহ নন, মিশরবাসীর স্বঘোষিত খোদা তিনি। মহাপ্রতাপান্বিত সম্রাটের মত সুদৃঢ় শৃঙ্খল দিয়ে বন্দী করে রেখেছেন তিনি সাম্রাজ্যের তাবৎ জনগণকে। মাঝে মধ্যেই তিনি ডেকে পাঠান দরবারী গণক ঠাকুরকে। শুনে নেন ভবিষ্যতের আগাম খবর। বরাবরের মত সেদিনও বাদশাহী ফরমান পেয়ে ছুটে এলেন দরবারী গণক। গণনা শেষ করে জানতে চাইলেনঃ 'হুজুর, ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে?'

ঃ 'নির্ভয়ে বল।'

তবু ঠাকুরের ভয় ঘুচেনা। ভয়ে ভয়ে বললেন ঠাকুরঃ 'মহারাজ, শুনুন তবে, পরম শুক্র এক আপনার নজদিগ পয়দা হবে বনি ইসরাঈল কওমে।'

শঙ্কিত হলেন ফেরাউন। প্রমাদ গুনলেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। উজীর-নাজীর আর সভাসদদের নিয়ে বসল জরুরী বৈঠক। বৈঠক ভাঙল চরম এক সিদ্ধান্তের ঘোষণা নিয়ে। পৃথিবীর মানুষ কোনকালে আর এমন ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শুনতে পায়নি। বস্তিতে বস্তিতে রাজদূতের ঘোষণা প্রচারিত হলঃ বনি ইসরাঈলের পুরুষ আর নারীরা শোন, আজ থেকে বনি ইসরাঈলের কোন নারী উদরে পুরুষ সন্তান ধারণ করতে পারবে না। কোন গর্ভবতী পুরুষ সন্তান জন্ম দিলে সে সন্তান তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হবে।

আতঙ্কে কেঁপে উঠল পুরুষদের বুক। বধূদের চোখের জলে ভিজে গেল রাতের বালিশ। চাঁদের জোসনায় ওরা প্রত্যক্ষ করল মৃত্যুর হীম-শীতলতা। বসন্তের বাতাস কেঁপে উঠল অজানা ত্রাস আর শংকায়।

নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য সম্রাট গড়ে তুললেন এক বিশাল বাহিনী। সুতীক্ষ্ণ ছোরা কোমরে গুঁজে ওরা ঘুরে বেড়াত ইসরাঈলী বস্তিতে। মেয়ে গুপ্তচররা বাড়ী বাড়ী তল্লাশী চালাত। এখানে সেখানে শোনা যেত ইসরাঈলী শিশুদের আর্তচিৎকার। সন্তানহারা মায়েদের বিলাপে ভারী হয়ে ওঠত মিশরের বাতাস। বধূদের করুণ কান্নায় দিশেহারা পুরুষদের অনেকেই স্ত্রীদের সাথে মিলিত হবার বাসনা ত্যাগ করে কাঁদত গুমরে গুমরে। ইরাঈলীদের এ করুণ কান্নায় কেঁপে উঠল খোদার আরশ। কিন্তু টললনা ফেরাউনের পাথুরে হৃদয়।

ফেরাউনের প্রাসাদ রক্ষী। এ ঘোষণা তাঁকেও করে তুলল চিন্তাগ্রস্ত। ফটকের পাশে রাতভর পাহারায় তিনি কাটিয়ে দেন বেদনার প্রহর। এক মধুর স্বপ্নে এক রাতে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। তাকিয়ে দেখলেন চাঁদের কোমল জোস্না তাকে ডাকছে। সেই মোহন ডাক তাঁকে আর স্থির থাকতে দিল না। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তিনি চলে এলেন সেখানে, যেখানে তার সন্তানদের নিয়ে ঘুমিয়ে আছে প্রিয়তমা স্ত্রী। ঘুমন্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে রইল। চাঁদের

www.pathagar.com

আলো নেভার আগেই ক্লান্ত মুসাফির কখন ফিরে এল নিজের জায়গায় জানল না পৃথিবীর কেউ। তারপর মাসে মাসে পূর্ণিমার চাঁদ — এল আর গেল। উৎকণ্ঠায় ভরে গেল রমণীর মন। উধাও হল শংকিত রমণীর চোখের নিঁদ। অবনত মস্তকে তিনি নিলেন প্রভুর স্মরণঃ 'হায় খোদা, রহম করো এ অভাগীর ওপর।'

স্বপ্ন দেখলেন তিনি। আশ্চর্য অভয়সূচক স্বপ্ন। বজাতককে সিন্দুকে ভরে নীল নদে ভাসিয়ে দেয়ার জন্য কে যেন চুপি চুপি বলে গেল তাঁকে। বলে গেল, ভয় নেই, তোমার কোলের শিশু তোমার কোলেই ফিরে আসবে আবার। শিশুকে ফেরাউনের হাতে তুলে দেয়ার চাইতে নীল নদে ভাসিয়ে দেয়া অনেক ভাল– ভাবলেন রমণী। সব শঙ্কা আর ভয় দূর হয়ে গেল তাঁর।

নবজাতকের মধুর চিৎকারে চোখ তুলে তাকালেন সেই পূণ্যময়ী। মনে পড়ে গেল তাঁর স্বপ্নের কথা। পাষাণে বুক বেঁধে শিশুকে তিনি ভাসিয়ে দিলেন নীল নদের জলে। থৈ থৈ নাচতে নাচতে মহা উল্লাসে নীলের জল তাঁকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে ছুটে চলল সম্মুখ পানে।

নীলের জলে সিন্দুক ভেসে যায়। সেই দিকে আড় চোখে ফিরে ফিরে চায় আর তীর ধরে হেঁটে যায় এক কিশোরী বালা। শঙ্কায় দুরু দুরু বুক। গোপন কান্নায় ফোলা ফোলা চোখ।

নীলের ধারে প্রমোদ ভবনে বসেছিলেন ফেরাউন ও সম্রাজ্ঞী বিবি আছিয়া। দেখছিলেন নীলের খেলা। ভাসতে ভাসতে সিন্দুক তখন সেই ঘাটে এসে হাজির। অবাক হলেন রাজা–রাণী দুজনেই। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে হুকুম দিলেন সিন্দুক তোলার। মহা উল্লাসে দাসদাসী সেই সিন্দুক এনে হাজির করল রাণীর দরবারে। ঢাকনা খুলে বিস্ময়ে বিমূঢ় রাণী। চাঁদের মত ফুটফুটে এক শিশু মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে। কী মিষ্টি আর মায়াময় চোখ! বিমুগ্ধ রাণীর মনে মমতার ঢেউ খেলে গেল। শিশুটিকে প্রতিপালনের এক অদম্য আকাঙ্খা নিয়ে তিনি তাকালেন সম্রাটের দিকে।

ফেরাউনের মনে তখন অন্য চিন্তা। শিশুকে দেখেই চমকে উঠল তাঁর বুক। দুশ্চিন্তায় মলিন হল মুখ। গণক ঠাকুর যে শিশুর কথা বলেছিলেন, এ কী সেই শিশু? শিশু হত্যায় নিয়োজিত বাহিনী চাইল শিশুকে। সম্রাজ্ঞী আছিয়া গেলেন রাজার দরবারে। ঃ 'জাহাঁপনা, এ শিশুটি ত আপনার ও আমার চোখের মণি।'

ঃ 'হাঁ, তোমার চোখের মণিত বুঝাই যায়। কিন্তু আমি এরূপ মণির প্রয়োজন অনুভব করিনা।'

www.pathagar.com

রাজার এ রূঢ়তায় কষ্ট পেলেন রাণী। কিন্তু সংকল্প থেকে সরে দাঁড়ালেন না। বললেনঃ 'এই বালক আমার ও তোমার চোখের মণি। একে হত্যা করোনা সম্রাট। আশ্চর্যের কি, হয়ত এ বালক আমাদের জন্য কল্যাণকরও হতে পারে। ইচ্ছে হয়, আমরা একে পুত্র বানিয়ে নিতে পারব।'

অবশেষে রাণীরই জয় হল। বিবি আছিয়ার কোলে উঠে হেসে উঠল শিশু। হারেমের সব দাসদাসীকে ডাকলেন বেগম। বললেনঃ 'শিশুকে দুধ পান করাবার জন্য একজন ভাল ধাত্রী খুঁজে আনো।'

একে একে অনেক ধাত্রী এল কিন্তু কারো দুধই পান করলনা শিশু। রাণী এবার বিপাকে পড়লেন। কি করে শিশুকে বাঁচাবেন তিনি।

তীরে তীরে হেঁটে আসা কিশোরীর মুখে ফুটে ওঠল একটুকরো মুচকি হাসি। এগিয়ে গেল কিশোরী মরিয়ম। বললঃ'আমি এমন একটা ঘরের খবর দিতে পারি, যে ঘরের লোকেরা এ শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং একে খুব ভালভাবে লালন-পালন করতে পারবে।'

এরপর মরিয়ম ছুটে চলল তার মায়ের কাছে। মায়ের বুকের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে খুলে বলল সব কথা। বললঃ 'শিগগীর চলো মা, আল্লাহ্ আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।'

এভাবেই শিশু ফিরে পেল জননীর কোল, আর জননীর কোল শীতল হল শিশুকে আকঁড়ে ধরে বুকে।

মায়ের কাছ থেকে তাঁর জন্মের এ কাহিনী শুনেছিলেন যুবক। জন্মের এ কাহিনী স্মরণ হতেই যুবকের মস্তক নত হয়ে এল তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে। এ ঘোর দুর্দিনে আবার তিনি স্মরণ করলেন সেই প্রভুকে।

ঃ 'প্রভু হে, যে কল্যাণ রেখেছ তুমি তকদীরে আমার, শুধু তার মুখাপেক্ষী রেখেছি হৃদয়।'

চাইলেন, এত তাড়াতাড়ি কেমন করে ফিরল তারা। ভিনদেশী সেই যুবকের কথা বলল যুবতীদ্বয়। বলল, এ জন্য যুবকের বিনিময় পাওয়া উচিত। পিতা তাকালেন তার কন্যাদের দিকে। ডেকে আনতে বললেন সেই যুবককে। যুবতীদের একজন আবার নেমে এল দুস্তর বালির সমুদ্রে। মরুদ্যানে পৌঁছে আনত নয়নে বললঃ 'আমাদের আব্বা হুজুর আপনার মোলাকাতে আগ্রহী। আপনাকে তিনি প্রতিদানের ইরাদা করেছেন। মেহেরবানী করে তাশরীফ আনবেন কি?'

www.pathagar.com

সহায়–সম্বলহীন, ক্ষুধায় কাতর যুবক ভাবলেন, অজানা–অচেনা এ বিদেশ বিভূঁইয়ে প্রভু কি তবে এভাবেই তাঁর নেয়ামতের দ্বার খুলে দিতে চাচ্ছেন? উঠে দাঁড়ালেন যুবক। অনুসরণ করলেন মরুদ্যানের মত মিষ্টি যুবতীর পায়ের চিহ্ন। বৃদ্ধকে যখন ছালাম করে দাঁড়ালেন যুবক, মনে হল রহমতের মেঘের মতই তিনি কোমল ও রহমদিল। যুবককে দেখেই বৃদ্ধের চোখে আশার বিদ্যুত খেলে গেল। এই কি সেই পূণ্যবান পুরুষ, যার অপেক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে প্রহর গুনছেন তিনি? যুবকের পরিচয় জানতে চাইলেন বৃদ্ধ। শঙ্কাহীন প্রসন্নচিত্তে যুবক নিজেকে মেলে ধরলেন সম্মানিত বৃদ্ধ আর তাঁর কন্যাদের দৃষ্টি সীমায়।

অজানা ইতিহাসের পাতা খুলতে খুলতে যুবক জানালেন, মায়ের কোলে যখন একটু শক্ত সামর্থ হলেন, তখন একদিন ফেরাউন–পত্নী তার মাকে খবর পাঠালেনঃ 'শিশুকে এনে আমাকে দেখাও। তাকে দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছি।' আর দরবারের লোকদের আদেশ দিলেন ঃ 'আমার আদরের শিশু আজ আমার গৃহে আসছে। অতএব, তাকে যথাযথ সম্মান আর উপঢৌকন দিতে হবে তোমাদের। আমি নিজে তা তদারক করব।'

তাকে নিয়ে মা যখন রাস্তায় বেরুলেন উপঢৌকনের বৃষ্টি হতে থাকল তাদের ওপর। বিবি আছিয়া তাকে পেয়ে বুকে চেপে ধরলেন আর দিলেন মূল্যবান পোশাক–আশাক ও উপঢৌকন। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল রাজ দরবারে। শিশুকে কোলে নেয়ার জন্য সম্রাট বাড়িয়ে দিলেন তাঁর হাত। কিন্তু কিছুতেই শিশু সম্রাটের কোলে যেতে রাজী হয় না। অবশেষে জোর করেই ফেরাউন তাকে কোলে তুলে নেন। অত্যাচারী বাদশাহর বিরুদ্ধে শিশু তার কচি কচি হাত দিয়ে বিদ্রোহের নিশান ওড়ায় সেদিনই। ফেরাউনের গালে হানে কষে এক চপেটাঘাত। ফেরাউন ক্ষিপ্ত হন। তাঁর বুকের ভেতর সন্দেহের কাঁটাটা খচ করে আরেকটু গভীরে ঢুকে যায়। না, শত্রুর শেষ রাখতে নেই — ভাবতে ভাবতে ফেরাউন মেতে ওঠেন তার হত্যার আয়োজনে।

ঃ 'তুমি ত এই বাচ্চা আমাকে দিয়ে ফেলেছ। এখন কী হচ্ছে?' জানতে চাইলেন ফেরাউন–পত্নী বিবি আছিয়া।

ঃ 'দেখনা, শিশু তার আচরণের মধ্য দিয়ে বলছে, আমাকে ধরাশায়ী করবে সে। আমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে।' হেসে উঠলেন সম্রাজ্ঞী। সম্রাটের সামনে বিছিয়ে দিলেন কৌশলের জাল।

ঃ 'এ ব্যাপারে ফয়সালার জন্য তুমি একটি মূলনীতি মেনে নাও। এ কী তাঁর সজ্ঞান প্রচেষ্টা নাকি বালসুলভ আচরণ তার পরীক্ষার জন্য বেছে নাও দুটোকরো অঙ্গার, আর

www.pathagar.com

দুটুকরো জ্বলজ্বলে মোতি। যদি সে মোতির পরিবর্তে হাতে তুলে নেয় জ্বলন্ত অঙ্গার, বুঝবে সে নির্দোষ।'

পরীক্ষা হল। সম্রাটের হত্যার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে শিশু হাতে তুলে নিল জ্বলন্ত অঙ্গার। সম্রাজ্ঞী বললেনঃ 'দেখলে ত ঘটনার আসল স্বরূপ!'

সেদিন থেকে রাজপ্রাসাদের আদর–যত্নে বেড়ে উঠতে থাকে শিশু। কৈশোর পেরিয়ে একদিন পা রাখে যৌবনের সিংহ দরোজায়। নির্যাতীত মানুষের জন্য কেঁদে ওঠে তার কোমল হৃদয়। শুরু হয় বুদ্ধির খেলা। ফেরাউনী দুঃশাসনের অধীনে শ্রমিকের কাজ করত ইসরাঈলী পুরুষেরা। খাটত পশুর মতই বিরামহীন সপ্তাহের সাতদিন। এতে তাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পেলে সাম্রাজ্যের ক্ষতি হবে, এই অজুহাত তুলে তাদের জন্য মঞ্জুর করা হল সপ্তাহে একদিন ছুটি। এভাবে যুবক তাঁর মমতাঘেরা হৃদয়ের জন্য হয়ে ওঠেন সকলের একান্ত আপন।

তন্ময় হয়ে বৃদ্ধ আর যুবতীরা শোনে তাঁর বিচিত্র জীবনের কথকতা। যুবক জানান তাঁর সমূহ বিপদের কাহিনী। সেদিন শহরবাসীরা ছিল অসতর্ক। যুবক শহরে প্রবেশ করে দেখলেন দুজন লোক মারামারি করছে। একজন নিজ জাতি ইসরাঈলের অপর জন কিবতী তথা ফেরাউনী কওমের। ইসরাঈলী লোকটি সাহায্যের আশায় ডাক দিল তাঁকে। তিনি এগিয়ে গেলেন এবং এমন এক ঘুষি দিলেন ফেরাউনীকে যে লোকটি তৎক্ষণাৎ মারা গেল। লোকটি নিহত হলে তিনি বলে উঠলেনঃ 'এ তো শয়তানের কাজ। হে আমার খোদা! আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি। আমাকে ক্ষমা কর। আর কখনো আমি পাপী লোকের সাহায্যকারী হবনা।'

পরদিন তিনি খুব ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে প্রত্যুষেই শহরাভিমুখে এগিয়ে গেলেন এবং দেখতে পেলেন গতকালের সেই লোকটিই আবার তাঁকে সাহায্যের জন্য ডাকছে। তিনি বলে উঠলেনঃ 'তুমি ত বড়ই বিভ্রান্তকারী হে!' এরপর তিনি যখন সেই লোকটির সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলেন, লোকটি ভয়ে চীৎকার করে বলে উঠলঃ 'তুমি কি আজ আমাকে তেমনি ভাবে হত্যা করতে চাও, যেমন কাল একজনকে হত্যা করেছ?'

গতকালের হত্যাকারীকে তখন খুঁজে ফিরছিল ফিরাউনী সম্প্রদায়। সম্রাটের কাছ থেকে তারা এ আশ্বাস পেয়েছে যে, হত্যাকারীকে সনাক্ত করতে পারলে তিনি হত্যার বদলে হত্যার ফায়সালা দেবেন। এবার তো সেকথা ফাঁস হয়ে গেল– এখন উপায়? প্রমাদ গুনলের যুবক। বিচলিত হলেন আশু কর্তব্য সম্পর্কে। যথাসময়ে সম্রাটের কানে পৌঁছল এ সংবাদ। কিন্তু তাঁকে পাকড়াও করার পূর্বেই এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে সংবাদ দিলঃ 'দরবারে তোমাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

www.pathagar.com

আমি তোমার একজন মঙ্গলাকাঙ্খী।' এ সংবাদ পেয়ে যুবক আরো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। 'হে আমার খোদা, আমাকে জালেমদের হাত থেরে রক্ষা কর' বলতে বলতে পা বাড়ালেন অজানার উদ্দেশ্যে।

বাদশাহী আদর-যত্নে লালিত পালিত যুবক আজ সম্বলহীন, নিঃসঙ্গ। অজানার উদ্দেশ্যে তিনি হেঁটে চলেছেন মরুভূমির বুক চিরে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর আতংকে ম্রিয়মান তিনি। দূর মরুভূমি পেরিয়ে তিনি এসে দাঁড়ালেন মাদইয়ানের মাটিতে। আল্লাহর রহমতের আশায় মরূদ্যানের ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরে এলিয়ে দিলেন ক্লান্ত দেহ-এ খবর জানলেন বৃদ্ধ আর তাঁর দুই যুবতী কন্যা।

ঃ 'ভয় পেয়োনা, এখন তুমি জালেমের আওতামুক্ত।'

আশ্বাসের বাণী ঝরে পড়ল বৃদ্ধের কণ্ঠ থেকে। যুবতীদের একজন বললঃ 'আব্বাজান, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত, সেই হতে পারে আপনার সর্বাপেক্ষা ভাল কর্মচারী। আপনি একে চাকরীতে নিযুক্ত করে দিন।'

যুবকের জন্য আবারো তাঁর প্রভুর রহমত বর্ষিত হল। প্রজ্ঞাবান বৃদ্ধ যুবকের জন্য পেশ করলেন এক আনন্দদায়ক প্রস্তাব।

ঃ 'আমি চাই, আমার এ দুটি কন্যার মধ্যে একজনের সাথে তোমার বিবাহ সম্পন্ন হোক। তবে এই শর্তে, তুমি আট বৎসর আমার এখানে চাকরী করবে। আর যদি পুরো দশ বৎসর করো, সে তোমার ইচ্ছে। আমি তোমার ওপর কোন কষ্ট চাপিয়ে দিতে চাইনা। ইনশাআল্লাহ, আমাকে তুমি নেক ব্যক্তি হিসেবেই দেখতে পাবে।'

কৃতজ্ঞ যুবক আবারো তাঁর স্রষ্টার প্রতি মস্তক অবনত করলেন। বললেনঃ 'আমার ও আপনার মধ্যে একথা ঠিক হয়ে গেল। এ দুটি মেয়াদের মধ্যে যেটিই আমি পূর্ণ করব, তারপর আর কিছুই বৃদ্ধি হতে পারবে না। আর আমরা যে সব কথাবর্তা ঠিক করছি, আল্লাহই তার নেগাহবান।'

মিশরের মাটিতে তখন তুমুল তোলপাড়। মহাপ্রতাপান্বিত ফেরাউনের বিশাল সেনাবাহিনী তখন সমগ্র মিশরের পথেঘাটে ছুটছে বল্গাহীন অশ্বের মত। চষে বেড়াচ্ছে শহর, লোকালয়, গ্রাম, প্রান্তর, অলিগলি, বস্তি সর্বত্র। কিন্তু কোথায় মূসা?*

---

* উৎসঃ [১] তাফহীমুল কোরআন -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
[২] তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন -মুফতি মুহাম্মদ শফি
[৩] ছহিহ্ আল বুখারী
[৪] মেশকাত শরীফ

www.pathagar.com

রাত দশটা। ব্যস্ততম নগরী জেরুজালেমের হোটেল এনজয়। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হলঘর। জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে নারী–পুরুষ। এনজয় এখন জমজমাট। খদ্দেরদের চোখে নেশা, মুখে ভাষা। এক টেবিলের একটি সীট এখনো খালি। বড্ড বেমানান দেখাচ্ছে। বার বার ঘড়ি দেখছে রায়হান। তাবাস্‌সুম কি আসবে না? আজ সকালেও তো টেলিফোনে আলাপ হলো। সাড়ে নটার মধ্যেই ওর এসে পৌঁছার কথা। বিরক্তিতে কপালটা কুঞ্চিত হয় রায়হানের। এমনতো করে না তাবাস্‌সুম। কি হলো আজ?

উজ্জ্বল আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। কোমল নীলাভ মায়াবী আলো এখন সারা ঘরে। ভুবনমোহিনী হাসি ছড়িয়ে অভিবাদনের ভংগিতে মঞ্চে আসে নর্তকী। কয়েক শ চোখ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে। এ সময় হলে প্রবেশ করে মিস তানিয়া। পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় তেইশ নম্বর টেবিলের দিকে।

ঃ 'হ্যালো মিঃ রায়হান, আপনার টেবিলে একটু বসে পারি?'

ঃবসুন।'

রায়হানের নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর।

তাবাস্‌সুমের অনুপস্থিতিতে তেঁতো হয়ে থাকা রায়হানের কণ্ঠস্বরের রুক্ষতা লক্ষ্য করে তানিয়া। বলেঃ 'জানেন, ও হঠাৎ একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ায় আসতে পারেনি। আপনি কষ্ট পাবেন ভেবে খবরটা দিতেই আমাকে পাঠিয়ে দিল।'

স্বাভাবিক হয়ে আসে রায়হানের গলা। নির্লিপ্ত ভাবটা কেটে গিয়ে ঔৎসুক্য ফুটে ওঠে চোখে–মুখে।

ঃ 'কী হয়েছে তাবাস্‌সুমের?'

ঃ 'সে না হয় ওর কাছ থেকেই শোনবেন। এবার অনুমতি করেন তো উঠি।'

ঃ 'বাহ্, সে কী করে হয়। আপনার নামটাইতো জানা হলো না?'

ঃতানিয়া।'

ঃ 'নামটা কিন্তু মিষ্টি।'

ঃ 'শুকরিয়া। তবু যে নামটা পছন্দ হলো।'

ঃ 'কথা বলার কায়দাটাও চমৎকার।'

www.pathagar.com

ঃ'আর?'

ঃ 'আর। এক নিঃশ্বাসেই সব জেনে নিতে চাইছেন?'

এভাবেই তাদের কথার গাড়ী এগিয়ে যায়। একজন আরেক জনকে বুঝতে চেষ্টা করে। রায়হান জানতে চায় ঃ 'কী খাবেন বলুন?'

ঃ 'বিদায় দিতে চাইছেন মনে হয়?'

ঃ'কেন?'

ঃ 'কষ্ট করে সংবাদটা পৌঁছালাম বলে সৌজন্যতা রক্ষা করছেন। না খাইয়ে কি করে বিদেয় দেবেন, তাই ভাবছেন বুঝি?'

ঃ 'তাই কি মনে হয় আপনার?'

ঃ 'তা না হলে আসুন আগে নাচটা উপভোগ করি। তারপর না হয় খাওয়া যাবে।'

এক মিনিট, দু'মিনিট—পাঁচ মিনিট। ধীরে ধীরে নাচের তাল দ্রুত হয়। উন্মুখ চেয়ে থাকে সকলে। এক সময় নাচ শেষ হয়। করতালিতে ভরে যায় হলঘর। উজ্জ্বল আলো আবার ফুটে ওঠে সেখানে। রায়হানের দিকে মুখ তোলে তানিয়া। রায়হান তাকায় তানিয়ার দিকে। আর কি আশ্চর্য, রায়হানের ভেতরটা তখন কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে তানিয়ার দিকে। স্মৃতির ভেতর হারিয়ে যায় সে। তেরো বছর আগের একটি মুখ ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। হঠাৎ স্থান-কাল ভুলে যায় রায়হান। এ যে সেই মুখ, সেই চোখ, 'সাদিয়া, প্রিয়তমা সাদিয়া আমার'-বলতে বলতে জড়িয়ে ধরতে যায় রায়হান তানিয়াকে।

ঃ 'কী বলছেন আপনি? কে সাদিয়া?' তানিয়ার দু'চোখ বিস্ফারিত। রায়হান সম্বিত ফিরে পায়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে। পরক্ষণেই আবার বসে পড়ে।

ঃ 'মাফ করবেন। আমার ব্যবহারের জন্যে আমি লজ্জিত।'

কয়েক মুহূর্ত দু'জন নিশ্চুপ। উজ্জ্বল আলোটা আবার নিভে গেছে। স্টেজে উঠে এসেছে নর্তকী। কিন্তু সেদিকে ওদের খেয়াল নেই। রায়হানের দৃষ্টি দূরে নিবদ্ধ। অসংখ্য টুকরো স্মৃতি এসে দখল করেছে ওর চেতনার স্বদেশ। নারীর স্বভাবসুলভ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দিয়ে তানিয়া বুঝতে পারে হৃদয়ের কোন কোমল যন্ত্রাংশে আঘাত লেগেছে রায়হানের। কণ্ঠে দরদ ঢেলে তানিয়া বলে ঃ'মাফ করবেন। আপনি এভাবে আঘাত পাবেন জানলে আসতাম না।'

ঃ 'আপনিতো কোন অন্যায় করেন নি মিস তানিয়া। আপনি কেন অযথা দুঃখিত হচ্ছেন?'

www.pathagar.com

একটু পর আবার মুখ খোলে রায়হানই ঃ'আসলে কী জানেন, অবিকল আপনার মতোই আরেক জনের সাথে আমার পরিচয় ছিল আজ থেকে তেরো বছর আগে।'

ঃ 'তিনি কে? কি হয়েছে তার?'

ঃ 'আমার স্ত্রী। আজ থেকে সতেরো বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন বিশ/একুশ। তখনো আম্মি বেঁচে আছেন। একদিন সন্ধ্যের পর আম্মির বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আম্মি তাঁর হাতের ইশারায় আমাকে বিছানার একপাশে বসতে বললেন। তারপর তাঁর শীর্ণ হাতের মুঠোয় আমার একটি হাত নিয়ে আদর করতে করতে বললেনঃ বেটা, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আমার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তোমার বাপ বেঁচে থাকলে আমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকতো না। তিনি যে তোমাকে আমার হাতেই সঁপে দিয়ে গেলেন। তোমার জন্যে একটা কিছু না করে যেতে পারলে মরেও যে আমি শান্তি পাবো না।'

আমি বাঁধা দিয়ে বললামঃ 'আম্মি, আপনি অযথা পেরেশান হবেন না। শিগ্‌গিরই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

ঃ 'না, বেটা, না। যা বলছি শোন, একটি শাদী কর বেটা। এ ঘর-দোর আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাই। বিকেলে তোমার চাচা এসেছিল। তার কাছে একটি পয়গাম আছে। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি ভালই হবে। তুমি অমত করো না বেটা।'

মায়ের সে আদেশ আমি ফেলতে পারিনি। এর কয়েক দিন পরেই সাদিয়ার সাথে আমার শাদী হয়ে যায়। ষোল বছরের সাদিয়া এসে আমাদের সমস্ত দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয়। আম্মিকে সে খুব ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করতো। আর আম্মি প্রাণ ভরে দোয়া করতেন আমাদের জন্যে। আম্মি মারা যাবার পর একমাত্র সাদিয়াই ছিল আমার হৃদয়ের শান্তি ও আশ্রয়।

রায়হানের ফেলে আসা জীবনের শোকগাঁথা তন্ময় হয়ে শুনছে তানিয়া। খানিক বিরতি দিয়ে বললো রায়হানঃ 'যাক তানিয়া, এসব বলে আর কী হবে। চলো তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ঃ 'রায়হান সাহেব!' ব্যথায় নুয়ে আসা তানিয়ার অস্ফুট মুখ থেকে উচ্চারিত হলোঃ 'আপনাকে তকলিফ দেয়ার কোন ইচ্ছে নেই আমার। তবু জানতে বড় ইচ্ছে হয়, বোন সাদিয়াকে কীভাবে হারালেন আপনি?'

তানিয়ার ব্যথাতুর চোখের তারায় চোখ রেখে রায়হান মুখ খোলে।

www.pathagar.com

ঃ 'আমার জিন্দেগীর সবচে কঠিন ও দুর্যোগময় রাত ছিল সেটি। ভাবতে পারিনি, জীবনের সুখ এত তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যাবে। অন্যান্য রাতের মতোই খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত তখন কত হবে বলতে পারি না। হঠাৎ গুলীর শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানায় উঠে বসলাম। ভয়ে সাদিয়ার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কে গুলী ছুঁড়ছে, কেন গুলী ছুঁড়ছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি বস্তির উত্তর মাথায় আগুন জ্বলছে। আমাদের বাসাটা ছিল বস্তির মাঝামাঝি। ব্যাপার কি ভাল করে বোঝার জন্যে বাইরে এসে দাঁড়াতেই দেখি চতুর্দিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আর ঠা-ঠা-ঠা-ঠা একটানা গুলীর আওয়াজ। চীৎকার দিয়ে বললামঃ 'জলদি সাদিয়া, ইহুদীরা আগুন দিয়েছে বস্তিতে। বাঁচতে হলে পালাতে হবে এক্ষুণি।' বাচ্চা দুটোকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এলো সাদিয়া। কিন্তু কোনদিকে পালাবো? চারদিকেই শত্রু, চারদিকেই আগুন। দেখতে দেখতে অনেক কাছে চলে এসেছে আগুনের শিখা। ভাববার ফুরসুৎ নেই আর। লাফিয়ে পড়লাম ঘোড়ার পিঠে। চাবুক কষতে থাকলাম। কিভাবে সে রাতে বস্তি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম বলতে পারি না।

সাদিয়ার অস্ফুট কাৎরানিতে এক সময় সম্বিত ফিরে পেলাম। দেখি ওর বাজু থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে। ঘোড়া থামালাম। বাচ্চাদের কোনরকমে আমার পিঠের সাথে চেপে ধরে রেখেছিল সে। আস্তে লাফ দিয়ে নামলাম নিচে। জায়েদ আর সোনিয়াকে নামিয়ে রেখে কোনরকমে কোলে তুলে নিলাম সাদিয়াকে। পাহাড়ের পাদদেশে শুইয়ে দিলাম। জামার আস্তিন দিয়ে কোনরকমে পট্টি বাঁধলাম ক্ষতে। ইতিমধ্যেই প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। চেষ্টা করলাম আর যেন রক্তপাত না হয়। পাহাড়ী ঘাসের রস দিলাম চিবিয়ে। রক্তপাত তো বন্ধ হলো। কিন্তু তারপর কি করবো ভেবে পেলাম না। চারদিকে শত্রু। দাঁড়াবার মতো শক্তি নেই সাদিয়ার। দু'টি মাসুম বাচ্চা সাথে। বাচ্চাদের কোলে নিলে সাদিয়াকে নিতে পারছি না। সাদিয়াকে তুলে নিলে বাচ্চাদের ধরার কেউ নেই। উপায়ান্তর না দেখে নিকটস্থ গুহামুখে আশ্রয় নিলাম। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঈষৎ বাঁকা চাঁদ যেন দাজ্জালের ছুরির মতো হেসে উঠলো আমার দিকে তাকিয়ে। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে এলো শরীর-মন। আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লো সাদিয়া। কোলে বসে জায়েদ-সোনিয়া মলিন মুখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। জায়েদের চোখে-মুখে পেরেশানি ঃ 'ডাক্তার ডাকো না আব্বু, আম্মি যে মরে যাবে।' ব্যাকুলতা ঝরে পড়লো তার কণ্ঠ থেকে। জনমানবহীন শূন্য ভয়াল প্রান্তরে তার উচ্চারণ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে দূরে মিলিয়ে গেল। আমি নির্বাক। কোমল কচি অসহায় মুখে প্রশ্নের ঢেউঃ 'কেন ওরা গুলী করলো আব্বু! কেনা ওরা আমাদের বস্তিতে আগুন দিলো?'

www.pathagar.com

ঃ 'ওরা যে আমাদের দুশমন।'

ঃ 'কারা দুশমন আব্বু?'

ঃ'ইহুদীরা।'

তারপর সব চুপচাপ। প্রশ্ন থেমে গেছে জায়েদের। আসন্ন সকালের প্রতীক্ষায় ম্লানমুখী চাঁদের আলোয় বসে থাকা একটি নির্যাতীত শিশু তার মাসুম বুকে যেন খোদাই করে নিচ্ছে একটি শব্দ–'ইহুদীরা।'

প্রতিদিনের মতই সূর্য উঠলো। কিন্তু কোন খোশ–খবরই বয়ে আনলো না সে আমাদের জন্যে। বরং নিয়ে এলো অনন্ত দুঃখের সওগাত। এক সময় চোখ মেলে চাইলো সাদিয়া। বড় করুণ, বড় যন্ত্রণাকাতর সে চাহনি। খুব মৃদুভাবে নড়লো তার ঠোঁট দুটো। অনন্ত হাসিতে উদ্ভাসিত মুখখানা দেখতে কেমন ম্লান আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অস্ফুট উচ্চারণ করলো সেঃ 'পানি।'

বাইরে বেরিয়ে এলাম। কোথায় পানি? এ যে কেবল পাহাড় আর পাহাড়। এদিক ওদিক তাকালাম। কোথাও এক কাতরা পানির সন্ধান পেলাম না। মনে পড়লো এখানে আসা পর্যন্ত ঘোড়াটির কোন তালাশ করিনি। ঘোড়াটি যেখানে রেখে এসেছিলাম, ছুটে গেলাম সেদিকে। কিন্তু পেলাম না। না পেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখতে চেষ্টা করলাম। কোন ঘোড়া, জনমানব, বস্তি, পানি, কিছুই নজরে এলো না। বিবি হাজেরার মতো উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে দৌড়ুলাম যতক্ষণ না পেরেশানিতে হাঁপিয়ে উঠলাম। ব্যর্থ হয়ে আবার এলাম গুহায়। সাদিয়া তাকালো আমার শূন্য হাতের দিকে। বুঝলো আশ–পাশে পানি পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। ওর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখের দিকে আমি তাকাতে পারছিলাম না। ইশারায় কাছে ডাকলো সে। আমি ঝুঁকে পড়লাম ওর মুখের কাছে। ডান হাতে আমার গলা জড়িয়ে আস্তে চুমু খেলো সাদিয়া। বললোঃ 'আমার জান, তোমাকে একটি অনুরোধ করবো। আশা করি ফেলবে না। আমার জিন্দেগীর সফর শেষ হয়ে এলো প্রিয়তম। খোদার কসম, আমার বেঁচে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই। যদি বিন্দুমাত্র ভরসা থাকতো তোমাকে আমি এ অনুরোধ করতাম না। এখানে এক মুঠো খাবার নেই, এক কাতরা পানি নেই। সোনিয়া আর জায়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো, ক্ষুধা আর পিপাসার যাতনা ওরা সইতে পারছে না। আমার জন্যে পেরেশান হয়ে কচি প্রাণ দুটি তুমি নষ্ট করো না। তুমি এক্ষুণি ওদের নিয়ে রওনা দাও। হয়তো সন্ধ্যের আগেই কোন লোকালয়ে পৌঁছে যেতে পারবে।'

আমি যেন বোবা হয়ে গেছি। সাদিয়াকে কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু জায়েদ ও সোনিয়াকে বুকের সাথে সাপটে ধরলাম।

www.pathagar.com

সন্ধ্যের একটু আগে সাদিয়া জান্নাতের পথে পাড়ি জমালো। কল্পনায় সোনিয়া ও জায়েদকে মুকতাদি বানিয়ে একা একা জানাযা আদায় করলাম। তারপর গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে এক রক্তাক্ত স্মৃতি নিয়ে আবার নেমে এলাম পথে। পেছনে পড়ে রইলো প্রিয়তমা স্ত্রী। যেনো কোন সুখ-স্বপ্নকে জিন্দেগীর মতো হারিয়ে ফেললাম। ওর শেষ আর্জি মনে পড়লোঃ 'জায়েদ ও সোনিয়াকে বাঁচিয়ে তোল। ওদের মাঝেই আমি বেঁচে থাকবো। প্রিয়তম, আজ থেকে তুমিই ওদের আব্বু ও আম্মি। মায়ের অভাব যেনো ওরা কোনদিন বুঝতে না পারে।'

বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে জায়েদ ও সোনিয়াকে। একথা মনে হতেই আমার সব ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়ে গেল। অপূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্নায় পাহাড় আর মরুভূমি একাকার করে এগিয়ে গেলাম। আকাশের তারা আমাদের নিশানা ঠিক করে দিল। সোনিয়া প্রথম থেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ক্ষুধার যাতনায় কাঁদতে কাঁদতে এক সময় জায়েদও ঘুমিয়ে পড়লো। ভোর রাতে এক খেজুর বাগান পেলাম। বাগানের পাশেই পাওয়া গেল কূপ। আল্লাহ্‌র অশেষ শোকর আদায় করলাম। বাপ ও বেটা-বেটিতে মিলে সেখান থেকে খেজুর দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করলাম। খেজুর পাতা দিয়ে রশি বানিয়ে তার মাথায় জামা বেঁধে নামিয়ে দিলাম কূপের ভেতর। ভেজা জামা চিপে তৃষ্ণা নিবারণ করলাম। অবসাদ নেমে এলো শরীরে। ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করে পথ চলতে শুরু করলাম তবু। বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে গেলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে শরীর বিদ্রোহ করলো। অগত্যা এক বৃক্ষতলে বসে পড়লাম।

ক্লান্তিতে নুয়ে এসেছিল শরীর। ঘুম এসে চোখের পাতা বন্ধ করে দিল। খোশনসীব এতটুকু যে, যখন ঘুম ভাঙ্গলো, দেখলাম, সওদাগরী এক কাফেলা এগিয়ে আসছে। আমার বিপন্ন অবস্থা দেখে দয়া হলো ওদের। কাফেলার সঙ্গী করে নিলো আমাদেরকে। অবশেষে একদিন পৌঁছলাম জেরুজালেম। আমার এক দূর সম্পর্কের রিসতাদার থাকতেন এখানে। বহু কষ্টে ওদের খুঁজে বের করলাম। ওদের পেশা ছিল তেজারতি। আমাকেও জড়িয়ে নিলেন তেজারতির কাজে। এভাবেই জেরুজালেমের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলাম আমি। বাসা নিলাম। জায়েদ ও সোনিয়ার জন্যে আয়া নিযুক্ত করলাম। ওস্তাদ রাখলাম লেখাপড়া শেখানোর জন্যে। বিত্তের জৌলুসে এখানকার জীবনযাত্রার সংগে দ্রুত মানিয়ে নিলাম নিজেকে। কিন্তু সাদিয়াকে ভুলতে পারলাম না। আজো তাই দ্বিতীয়বার বিয়ের চিন্তা করিনি। নিঃসঙ্গতা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন চলে আসি ক্লাবে। একটু ফুর্তি করি, মদ খাই। ভুলে যেতে চাই জীবনের সব জ্বালা-যন্ত্রণা।"

তন্ময় হয়ে শুনছিল তানিয়া। সাদিয়ার জীবনের শেষ মুহূর্তের কথাগুলো শুনতে শুনতে হারিয়ে গিয়েছিল তানিয়া স্মৃতির ভেতর। চোখের পাতা ভারী হয়ে গিয়েছিল। টপ টপ করে

www.pathagar.com

গড়িয়ে পড়েছিল ক'ফোটা অশ্রু মনের অজান্তেই। রায়হানের জীবনের এসব করুণ স্মৃতি নিঃসন্দেহে কষ্টকর। কিন্তু তানিয়ার জীবনেও যে এক বুক দুঃখ লুকিয়ে আছে ওর হাসি-খুশী মুখটি দেখে কেউ কি তা কল্পনা করতে পারে? পারে না। যেমন তানিয়া পারেনি রায়হানের দুঃখগুলো অনুভব করতে। এমন কি তাবাস্‌সুমও। তানিয়াই কথা বলেঃ 'চলুন আজ ওঠা যাক। দেখছেন না হোটেল বন্ধ হতে চলেছে। সব লোকজন প্রায় চলে গেছে।'

ঃ 'সরি, এতটা সময় পার হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। চলুন।'

উঠে দাঁড়ায় রায়হান ও তানিয়া। বিল পরিশোধ করে তারা বেরিয়ে আসে উন্মুক্ত রাতের কোলে। 'খোদা হাফেজ' বলে পর পর হোটেল লাউঞ্জ ছেড়ে বেরিয়ে যায় দুটো গাড়ী। রাত তখন প্রায় একটা।

রায়হানের অশান্ত মন মরুভূমির মতো হু হু করে ওঠে। মনের পর্দায় যুগপৎ ভাসতে থাকে দুটো মুখ — সাদিয়া ও তানিয়া। মসজিদুল আক্‌সার পাশ দিয়ে যাবার সময় নিজের অজান্তেই গাড়ীর গতি কমে আসে। তাকিয়ে দেখে রায়হান। মুসলমানের প্রথম কেবলা। দু'দিন বাদে হয়তো ইহুদীদের আস্তাবলে পরিণত হবে। যেমন, ইতিমধ্যে অনেক মসজিদকে তারা খোঁয়াড় বানিয়েছে। রায়হানের মনটা আরো ভারী হয়ে আসে। বেদনার করুণ সুর বেজে ওঠে মনের গহীনে। বাসার দিকে না গিয়ে রায়হান গাড়ীর গতি সোজা পূর্বদিকে ঘুরিয়ে দেয়। শহর ছেড়ে আরো কিছুদূর এগিয়ে যায় মেইন রাস্তা ধরেই। তারপর গাড়ী নামিয়ে দেয় এবড়ো-থেবড়ো পাহাড়ী রাস্তায়। যতদূর সম্ভব এঁকে-বেঁকে উঠে যায় উপরে। গাড়ী নিয়ে এগুনোর পথ বন্ধ হলে গাড়ী থামিয়ে হাঁটতে থাকে। কাঁটা গুল্মলতা তার পথ আটকে দাঁড়ায়। তবুও থামে না রায়হান। পাহাড়ের চূড়ায় খুঁজতে থাকে গুহামুখ। যে ধরনের গুহামুখে তেরো বছর আগে একদিন পাথর চাপা দিয়েছিল প্রিয়তমা স্ত্রী সাদিয়াকে।

একটি চূড়া থেকে নেমে আরেকটি চূড়ায় গিয়ে ওঠে সে। ক্লান্তিতে নুয়ে আসে শরীর। তবু তার পা থামে না। হাঁটতেই থাকে। হাঁটতে হাঁটতেই তার চোখ পড়ে এক টুকরো সমতল ভূমির উপর। চারদিকে তার পাহাড় পরিবেষ্টিত। সমতল ভূমিতে জ্বলছে এক টুকরো আগুন। পাশে গোটা তিনেক তাঁবু। তাঁবুর সামনে বসে আছে একদল যুবক। অবাক হয় রায়হান। এ দুর্গম পাহাড়ে বলতে গেলে সাধারণ মানুষের কোন যাতায়াত নেই। তবে এরা কারা? ডাকাত? কিন্তু ওদের চেহারা-সুরতে সেরকমটি মনে হয় না রায়হানের। টিলার ওপর বসে পড়ে সে। দেখতে থাকে লোকগুলোর কাজ-কর্ম।

পৃথিবীর সীমানা থেকে আরো কিছু সময় হারিয়ে যায়। রায়হানকে অবাক করে দিয়ে লোকগুলো এক সময় কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। তারপর গভীর নিষ্ঠা সহকারে নিমগ্ন

www.pathagar.com

হয়ে পড়ে সালাতে। এরা কি মানুষ না ফেরেশতা? বিস্ময় ঝরে পড়ে তার চোখ থেকে। যে করেই হোক জানতে হবে এরা কারা? আস্তে আস্তে সমতল ভূমির দিকে নেমে যায় রায়হান। তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছতেই পেছনে থেকে হেঁকে ওঠে একজনঃ 'কে, কে ওখানে?'

থমকে দাঁড়ায় রায়হান। তারপর কিছু বোঝার আগেই তিনজন লোক ক্ষিপ্র হাতে তার হাত-পা বেঁধে ফেলে। লোক তিনজন তাকে নিয়ে একটি তাঁবুর ভেতর ঢোকে। যেন কিছুই হয়নি এমনি নির্বিকার ভংগিতে পড়ে থাকে রায়হান। শোক-তাপ, ভয় কিছুই যেন আজ স্পর্শ করছে না তাকে!

সালাত শেষে তাঁবুতে প্রবেশ করেন এক সুদর্শন তরুণ। মুখে পবিত্রতার ছাপ। চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। সালাম দিয়ে বসলেন তিনি।

ঃ 'মেহেরবানী করে আপনার পরিচয় এবং এখানে আগমনের কারণটা একটু বলবেন?' আদেশের পরিবর্তে অনেকটা অনুরোধের সুর তরুণের মুখে।

সংক্ষেপে পরিচয়সহ পুরো ঘটনা তুলে ধরে রায়হান। মনে হলো যুবকেরা তা বিশ্বাস করেছে। তবু তাকে ছেড়ে দিলো না তারা।

ভোর হবার আগেই তাঁবু গুটিয়ে যুবকরা সরে পড়লো সেখান থেকে। শুধু দু'জন যুবক রয়ে গেলো। তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। গাড়ীতে পৌঁছে একজন ড্রাইভিং সিটে বসলো, একজন তার পাশে। মেইন রোডে পৌঁছে গাড়ী থেকে নেমে এলো যুবকদ্বয়। বিদায় দিতে গিয়ে একজন বললোঃ 'জনাব, আপনাকে তকলিফ দেয়ার জন্যে আমরা সত্যি দুঃখিত। এবার সোজা বাড়ীর দিকে যাত্রা করুন। আপনার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে শীগ্‌গিরই আপনার সাথে আমাদের দেখা হবে। খোদ হাফিজ।'

ঃ 'বহুত শোকরিয়া। আমি আপনাদের জন্যে ইন্তেজার করবো।' বলেই রায়হান স্টিয়ারিংয়ে হাত রাখে। গাড়ী এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

এ ঘটনার পর থেকে সম্পূর্ণ পাল্টে গেল রায়হানের জীবনধারা। চিন্তা-চেতনায় এলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বহুদিন পর নামায ধরলো রায়হান। হোটেল এবং বারে যাওয়া ছেড়ে দিল। তবু তার মনে কোন স্বস্তি নেই। বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। সেই যুবকদের কারো সাথে আর দেখা হলো না। অথচ তাদের সাথে দেখা করার জন্যে মনের ভেতর থেকে সে প্রচুর তাগিদ অনুভব করতে থাকলো। পর পর কয়েক রাত সেই দুর্গম পাহাড়ে তাদের তালাশে গেল। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলো না সে। গোপনে কুরআন-হাদীস ও

www.pathagar.com

কিছু ইসলামী বইও সংগ্রহ করে ফেললো। এগুলো পড়ে তার মনের আগুন আরো বেশি করে জ্বলে উঠলো।

কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা। নিজের চেম্বারেই যোহরের সালাত আদায় করলো সে। লাঞ্চে যাবে এমন সময় একজন পিয়ন সংবাদ দিলোঃ 'খুব দরকারে একজন লোক তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছে। লাঞ্চের কথা বলার পরও সে লোক নিরস্ত হচ্ছে না।'

ঃ 'পাঠিয়ে দাও। আর হ্যাঁ শোন'– কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল সে। বললঃ 'ঠিক আছে, যাও।' একটি ক্ষীণ আশার বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর মনের কোণে। খানিক বাদেই তাকে অবাক করে দিয়ে ঘরে ঢুকলো তারেক সাইফুল্লাহ। ইখওয়ানুল মুসলেমুন–এর জেরুজালেমস্থ প্রতিনিধি।

ঃ 'আসসালামু আলাইকুম।'

ঃ 'ওয়ালাইকুমুস সালাম।' বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রায়হান।

মোসাফেহার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল তারেক। এ যুবকই সে রাতে তার সাথে কথাবার্তা বলেছিল; চিনতে পারে রায়হান। দীর্ঘ সময় ধরে তাদের মধ্যে আলোচনা হলো। এভাবেই একদিন মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের সাথে জড়িয়ে পড়ে রায়হান। ক্রমে তার অফিস ও বাসা হয়ে ওঠে ইখওয়ানের ঘাঁটি।

জায়েদ এখন আঠারো বছরের যুবক আর সোনিয়ার বয়স পনর। পিতার পরিবর্তন তাদের দৃষ্টি এড়ায় না। তারা বুঝতে পারে, পিতা কোন গোপন তৎপরতার সাথে জড়িয়ে পড়েছেন গভীরভাবে। পিতার আচরণ, ইখওয়ান কর্মীদের ভালবাসা ক্রমে সচেতন করে তোলে জায়েদ এবং সোনিয়াকেও। মায়ের মৃত্যুর সময় নতুন একটি শব্দের সাথে পরিচয় হয়েছিল মনে পড়ে জায়েদের। ইহুদীরা। আম্মিকে যারা খুন করেছিল। যারা আগুন দিয়েছিল বস্তিতে। সেদিন থেকে ঘৃণা দিয়ে লালন করেছে জায়েদ এ শব্দটিকে। ইহুদীদের জালিম হাত ভেংগে গুড়িয়ে দেয়ার দুর্মর আকাঙ্খা অনুক্ষণ যায়েদকে পীড়িত করতো। ইখওয়ানের সাথে পরিচিত হবার পর থেকে সে যেন তার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের পথ খুঁজে পায়। ইখওয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কোরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজকে গড়ে তুলতে থাকে যায়েদ ও সোনিয়া।

রায়হানের পরিবর্তীত জীবনধারার খবর যায় ইহুদী গোয়েন্দা পুলিশের কাছে। সতর্কতার সাথে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকে গোয়েন্দা পুলিশ। এক রাতে রায়হানকে তারা ধরে নিয়ে যায়। আর কোনদিন জায়েদ ও সোনিয়ার সাথে তার আর দেখা হয় না। ইখওয়ান কর্মীদের কাছ থেকে নেয়া হয় না বিদায়। তার আগেই তার পবিত্র আত্মা জান্নাতের পথে পাড়ি জমায়।

www.pathagar.com

জায়েদ ও সোনিয়া বুঝতে পারে এবার তাদের পালা। এভাবে মার খাওয়ার কোন মানে হয় না। তার আগেই সরে পড়া উচিত এবং সুযোগ মত আঘাত হানা উচিত দুশনের হৃৎপিন্ডে। ভাই–বোন পরামর্শ করে। সোনিয়া জানতে চায়ঃ 'কানা দাজ্জালের সাথে কি করে পারবো আমরা, ভাইয়া?'

ঃ 'পারবো রে, পারবো। আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন আর আছে তার অফুরন্ত নেয়ামত। রাসূলের কথা কি ভুলে গেলি তুই? তিনি তো বলেছেন, 'তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। সেই সময় কোন ইহুদী পাথরের আড়ালে লুকালে পাথরও ডেকে বলবেঃ হে মুসলিমগণ! এই দেখ, আমার আড়ালে ইহুদী লুকিয়ে আছে, একে হত্যা করে ফেল। দুনিয়া তাদের জন্যে এতই সংকীর্ণ হয়ে যাবে।'

ঃ 'তাই বুঝি সারা দুনিয়া থেকে তাদের এনে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। যেন তাদের খুঁজতে গিয়ে সারা দুনিয়া চষে বেড়াতে না হয়।'

ঃ 'ঠিক তাই।' বলতে বলতে হেসে ওঠে ভাই–বোন।

বাড়ী থেকে বেরুনোর আগে ওরা এক টুকরো কাগজে লিখলোঃ

"যারা আমার আম্মিকে খুন করেছে
যারা ফেরত দেয়নি আমার আব্বুর লাশ
আমাদের বস্তিতে যারা আগুন জ্বালিয়েছিল
আমাদের পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিল যারা
আমাদের পয়লা কেবলাকে যারা কুক্ষিগত করেছে
অভিশপ্ত সেই ইহুদীদের জন্যে–
যারা আল্লাহ্‌র আইনকে বৃদ্ধাংগুলি দেখায়,
জেহাদের শপথ নিয়ে নেমে গেলাম পথে।
আমরা নীরব হবো না
নিথর হবো না
নিস্তব্ধ হবো না
বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।"

কাগজের টুকরোটা দরজায় টাংগিয়ে ওরা নেমে এলো পথে। বাইরে তখন চাঁদের আলো। রাতের শরীরে বাতাসের গান। দূরে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে জায়ন পাহাড়।

www.pathagar.com

বিদ্রোহী

অন্ধকারেও ওদের পায়ের গতি কিছুমাত্র কমেনা।
দ্রুত পা চালায় সকলে।
বুকের ভেতর আশার স্রোত বয়।
স্বপ্ন দেখে। রঙিন সপ্ন।
ঘর বাঁধবে। সুখের ঘর।
পাখীর নীড়ের মত
ছিমছাম সুন্দর একটি শান্তির নীড়।
আবার ওরা সুখী হবে।
ভুলে যাবে ফেলে আসা সন্ত্রাসের কালো রাত।
বুকের ভেতর এখন এমনি স্বপ্নের থৈ থৈ প্লাবন।

এগিয়ে চলে কাফেলা।
পেছনে পড়ে থাকে অনেক টুকরো স্মৃতি।
সুখ-দুঃখের।
আনন্দ-বেদনার।
শৈশব-কৈশোরের।
কারোর যৌবনের উচ্ছল স্বপ্নময় দিনগুলো
স্মৃতির ল্যাম্পে আটকে যায়।
চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে।
বেদনার নীল নদী দাপাদাপি করে বুকের ভেতর।
হাঁটতে হাঁটতে অজান্তেই বারবার

www.pathagar.com

পেছনের দিকে ছুটে যায় দৃষ্টি।
কিন্তু না। থামেনা ওরা।
সম্মুখে ওদের পায়ের গতি।
মাটির মায়া ছেড়ে ওরা এগিয়ে চলে অনিশ্চিত গন্তব্যে।
পেছনে পড়ে থাকে প্রিয় জন্মভূমি। ক্রমে
হারিয়ে যায় জন্মভূমির মাটির সুঘ্রাণ।

রাতের প্রথম প্রহর শেষ না হতেই শুরু হয়েছিল যাত্রা।
এখন অনেক রাত। আকাশের পানে তাকায় কেউ কেউ।
দেখে ভাঙা চাঁদ।
মলিন তারকা।
কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সাতভাই চম্পারা।
হারিয়ে গেছে আদম সুরতের কায়া।

আঁধার আরো ঘনীভূত হয়ে আসে।
খানিক্ষণ জমাট বেঁধে থমকে থাকে।
তারপর আবার গলতে শুরু করে অন্ধকার।
তখন
অন্ধকারের নেকাব সরিয়ে উঁকি দেয় ফিকে আলো।
খুব কুসুমিত। খুব মোলায়েম।
মনে হয়, বেহেশতের দরজা খুলে
নেমে আসছে স্নিগ্ধ আলোর কুসুম।

যাত্রীদের ক্লান্ত দৃষ্টি ডানে বায়ে আছাড় খায়।
হতাশা আর ভীতির বিষ মাখানো সে দৃষ্টি।
অবসাদ যেন খামচে ধরে শরীরের পেশী।
পা আর চলেনা।
শ্লথ হয়ে আসে চলার তীব্রতা।
নিস্তেজ হয়ে আসে দেহ।
ক্লান্তি...ক্লান্তি...ক্লান্তি.....

এরই মাঝে ফুটে ওঠে সুবেহ সাদিকের স্নিগ্ধতা।
ফুরফুরে হাওয়া আসে।

www.pathagar.com

গায়ে মুখে পরশ বুলায় ঠান্ডা শীতল আমেজ। ওরা
ইতিউতি তাকিয়ে খোঁজে নিরাপত্তার আশ্বাস।
বুকের ভেতর শান্তির উন্মুখর প্রত্যাশা।
কিন্তু কোথায় শান্তি?
কোথায় নিরাপত্তা?
চারদিকে শুধু হতাশার ধূ ধূ প্রান্তর।

কে দেবে এখানে আশার আজান?
এখানে নেই কেন জনমনিষ্যির ছায়া।
নেই কোন বস্তি।
নেই খীমা, কাফেলার তাবু।
ব্যর্থতা আর হতাশার গ্লানি আরো বেড়ে যায় কাফেলায়।

হায়! এ যে এক জনহীন নিস্তব্ধ নিরব প্রান্তর।
চারদিকে খা খা শুন্যতা।
কোন পাখীর কণ্ঠে বাজেনা শ্বান্তনার সুর।
কোন প্রাণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় না আশ্বাসের বাণী।
শুন্যতা।শুন্যতা।বিশাল শুন্যতা।
তবু একদন্ড দাঁড়াবার সাহস হয়না কারো।
প্রান্তর মাড়িয়ে ওরা সামনে পা চালায়।

আরেকটু ফর্সা হয় আকাশ।
অকস্মাৎ কে একজন কাফেলা থেকে আজান হাকে।
নৈশব্দের প্রচন্ডতা খান খান হয়ে যায়।
প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে শান্তির ললিতবাণী।
নিজকে ওরা নিঃশেষে সমর্পন করে আপন প্রভুর হাতে।
পৃথিবীর সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লুটিয়ে পড়ে সিজদায়।

তারপর?

তারপর ওরা যখন সেজদা থেকে মাথা তুলে উঠে দাঁড়ালো
কী আশ্চর্য!
যেনো কোন ক্লান্তি নেই কারো।

www.pathagar.com

যেনো কোনদিন কোন ক্লান্তি ওদের ছিলনা।
শ্রান্ত পেশীতে ফিরে এল সতেজ সজীবতা।
দেহে এল অফুরন্ত হিম্মত ও কুওৎ।
পায়ে এল এগিয়ে চলার সুতীব্র গতি।
আবার ওরা পা বাড়াল অজানার উদ্দেশ্যে।
পুরোনো স্মৃতিরা এসে ভীড় করলো আবার।
ফিরে এল স্বপ্ন।
ফিরে এল আশার সেই সোনালী পাখীরা।

পূব দিকের স্বচ্ছ আকাশে ফুটে উঠলো রক্তিম আভা।
সে আভা ভেদ করে
হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল অবিনাশী আলোর গোলক।
সূর্য এল তার প্রসন্নতা নিয়ে।
জলের কোমলতা ভেঙে এগিয়ে যাওয়া রাজ হংসের মত
সাঁতার কেটে কেটে সে-ও এগিয়ে চলল উপরে।

সহসা গুঞ্জন উঠলো কাফেলায়।
সামনের যাত্রীরা চেঁচিয়ে ওঠলোঃ
ঐ ঐ দেখা যায় রূপোলী জলের ঝিলিক।
ঐ শোন সমুদ্রের শোঁ শোঁ গর্জন।
আনন্দে আত্মহারা এবার যাত্রীরা।
খুশীর আমেজ নিয়ে পৌঁছল সমুদ্রের উপকূলে।
আহ্ মুক্তি!
শুধুমাত্র সমুদ্রটা পেরোনো যা বাকী।
তারপর নিরাপত্তা, আশ্রয়, সুখ আর শান্তি।
ওদের চোখে চিকচিক আনন্দের জোয়ার।

আর কোনদিন জালিমের উদ্যত খড়্গ
ঝলসে উঠবেনা মস্তকের ওপর।
আর কোনদিন ইজ্জত হারাবেনা
হংস বলাকার ঝাঁক।
চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে কণ্ঠের ভাষা

www.pathagar.com

এগিয়ে আসবেনা কোন পাষান্ড দানব।
আতুড় ঘরেই হারিয়ে যাবেনা
পুষ্পকলি শিশুদের মুখ।
এসব ভাবতে ভাবতে ওদের চোখে নামে কৃতজ্ঞতার আঁসু।
আচানক একজন যাত্রী দেখলো
দূরে, বহুদূরে–দৃষ্টির প্রান্ত সীমায়
মেঘের মত কৃষ্ণ কালো ধুয়ার আভা।

আরো কয়েকটি মুহূর্ত গড়িয়ে পড়লো সমুদ্রে।

না। ধুয়াঁ নয়। মেঘ নয়। মানুষ আর ঘোড়া।
ঘোড়া আর মানুষ।
কোন সৈনিকের কাফেলা।
হ্যাঁ! ঐতো! দুশমন। জালিম। আসছে,আসছে।
দ্রুত... দ্রুত...দ্রুত...
কী বিশল বাহিনী।
কী দুরন্ত গতি।
দুর্বার, দুর্বার ছুটছে ঘোড়া।
পেছনে উড়ছে ধুলির ঝড়।
খুরের একটানা খটখট শব্দে সন্ত্রাসের তরঙ্গ।
মুক্ত কৃপাণের ঠোঁটে দাজ্জালের অট্টহাসি।
কাফেলার যাত্রীদের মুখ ফ্যাকাশে।

ছুটে আসছে সেই জালিম বাদশা–
যার অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে ওরা
ছেড়ে এসেছে চিরদিনের সাজানো বসতবাটি।
ভুলেছে জন্মভূমির মায়া।
ছেড়েছে নগর।
পাড়ি জমিয়েছে অজানার উদ্দেশ্যে।

সন্ত্রাসের নায়ক আসছে।
চোখে তার ক্ষ্যাপা কুকুরের হিংস্রতা।
মুখে লাথি দিয়ে পালিয়ে যাবে পুচকে শিকার

www.pathagar.com

এরচে অপমানের আর কী আছে?

সূর্যের কিরণে ঝলসে উঠলো খঞ্জরের ধার।
আশংকা দেখা দিল কাফেলার অনেকের মনেই
আর বুঝি রক্ষে নেই।
বুঝি, জীবনের সব লেনদেন চুকে বুকে যাবে এখনি।
বিশাল বাহিনীর সামনে
গুটিকয় অসহায় নারী ও পুরুষ
কী করে ওরা জীবনের আশা করতে পারে?

ব্যাকুল চোখে সমুদ্রের দিকে চাইলো সবাই।
উত্তাল সমুদ্র জোয়ার সামনে তাদের।
পেছনে দুশমনের অপ্রতিরোধ্য বিশাল বাহিনী।
আবারো সমুদ্রের দিকে তাকালো সবাই।
না। উপকূলে নেই কোন কিশতি।
নজরে পড়েনা কোন জাহাজের মাস্তুল ।
যতদুর দৃষ্টি যায়
একটি পালের নৌকাও চোখে পড়েনা কারো।

মুখের গ্রাস হাতের মুঠোয় ভেবে
অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ফেরাউন।
বিপন্ন যাত্রীরা কেঁদে ওঠেঃ
হে আল্লাহ! আমাদের বাঁচাও প্রভু!

সমুদ্রের কোল ঘেষে দাঁড়ান রাহবার।
প্রভুর স্মরণ নিয়ে
সমুদ্র বক্ষে ছুঁড়ে দেন কুদরতের লাঠি।
উন্মুক্ত রাজপথের বিশাল ব্যাপকতা সৃষ্টি করে
খাড়া পাহাড়ের মত
দু'দিকে সরে দাঁড়ায় সমুদ্রের জল।
আর
নির্ভীক চিত্তে সে পথে এগিয়ে যায় অসহায় ক্ষুদ্র কাফেলা।

www.pathagar.com

বিস্ময়ের ঘোর তরঙ্গ ফেরাউনের চোখে।
আহম্মকের মত থমকে দাঁড়িয়ে থাকে সে।
তার অহংকার– তার গর্ব
তবে কি এবারও খর্ব হবে?
এবারও কি বেঁচে যাবে অসহায় মুসা ?
তার এ বিরাট ফৌজি প্রস্তুতি তবে কার জন্য?
কিসের জন্য?
কোনদিনের জন্য?

নিশ্চলতা থেকে নড়ে ওঠে বিমূঢ় ফেরাউন।
ক্ষমতার গর্ব
কিছুতেই তাকে স্থির থাকতে দেয়না।
পলকে সিদ্ধান্তে আসে সে।
চরম সিদ্ধান্ত ।
যে করেই হোক
ধরতে হবে মুসাকে। কেননা,
মুসার বিনাশের সাথে তার অস্তিত্বের সম্পর্ক জড়িত।

ঘোড়ার পাছায় চাবুক লাগায় ফেরাউন।
লাফিয়ে পড়ে মুসার রেখে যাওয়া
অলৌকিক পথে।

তারপর?

তারপর জন্ম নেয় ইতিহাস।
পিরামিডের মমি হয়ে বেঁচে থাকে ফেরাউন।
বেঁচে থাকে পৃথিবীর তাবৎ বিদ্রোহীর
সমূহ পরিণতির অনির্বাণ স্বাক্ষী হয়ে।

www.pathagar.com

প্রফেসর আবদুর রহমান এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের একটা বেঞ্চের উপর বসে আছেন। মাথার উপর কড়া রোদ। শার্টের হাতা গুটানো। চুল উস্কো খুস্কো। অবিন্যস্ত বেশবাস। দৃষ্টি উদাস। চোখের মনি গতরাতের অনিদ্রার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

একভাবে বসে আছেন তিনি বেঞ্চটার উপর। অনেকটা ঝড়ো হাওয়ায় ডানা ভাঙ্গা কাকের মত ক্লান্ত, বিষন্ন। অথচ এসময় তার ক্লাশে থাকার কথা। গতরাতের দুঃসপ্নটা দেখার পর থেকে কি যে হলো– কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছেন না তিনি। উহ! কী ভয়ঙ্কর দুঃসপ্ন। কারা যেন তাকে টানতে টানতে বিশাল এক অগ্নিকুন্ডের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হাত পা ছুঁড়ে যতই তিনি ছুটতে চেষ্টা করছেন ততই আরো শক্ত করে ধরে রাখছে ওরা। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক সাহায্যের আশায় তাকালেন তিনি। কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না। দূরে–বহুদূরে এক ঝালোমলো প্রাসাদে এ সময় ভেসে উঠলো একটা মুখ। মুখে মৃদু হাসি। ঘনকালো চাপ দাড়ি তার মুখে। আবদুর রহমানকে ডাক দেয়ার ভঙ্গিতে হাত তুললেন তিনি। কিন্তু আবদুর রহমানকে ধরে রাখা লোক গুলো তাকে ক্রমেই আগুনটার দিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

থেকে থেকেই এই স্বপ্নটা তাকে চাবকাচ্ছে যেন। বাসা থেকে বেরুলেও শেষ পর্যন্ত তাই আর ক্লাশে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। রিক্সাটা যখন টি, এস, সি অতিক্রম করছিল তখনই কী মনে করে রিক্সা থামিয়ে নেমে পড়েছিলেন।

রিক্সা থেকে নেমে প্রথমে একবার ঢুকেছিলেন টি, এস, সির ভেতর। কিন্তু প্রচন্ড অস্থিরতায় বেরিয়ে এসেছিলেন সাথে সাথেই। তারপর টি,এস,সির ছোট্ট লনটা পেরিয়ে সোজা এসে ঢুকলেন পার্কে। হাঁটতে হাঁটতে এই বেঞ্চটার নিকট এসে থামলেন। বেঞ্চের আশপাশের সবুজ ঘাসের ভেতর কিছু খুঁজলেন খুব নিবিষ্ট মনে। থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে এসে এই বেঞ্চটায় বসেছেন, সে প্রায় ঘন্টা দুই হয়ে গেল।

শিশুপার্কের সামান্য দক্ষিণে যে এঁদো পুকুর তারই পাশে বেঞ্চটা। বেঞ্চের পাশ জুড়ে

www.pathagar.com

সবুজ ঘাসের ডগা। পুকুরে তেমন পানি নেই। তলানীতে বৃষ্টির জল জমে আছে সামান্য। পুকুরের উত্তর পশ্চিম কোণে সিমেন্টের ছাতা আছে একটা। অবশ্য সেখানে যাবার চেষ্টা একবারও করেননি আবদুর রহমান। যদিও সেখানে রোদের উত্তাপ থেকে কিছুটা রেহাই পেতেন।

পার্ক এখন ফাঁকা। লোকজন নেই বললেই চলে। কেবল কড়া রোদ উপেক্ষা করে দু'একটি জুটি নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছে এখানে সেখানে, ঝোপের আড়ালে। যদিও এসে অব্দি আবদুর রহমান কারো দিকেই তাকিয়ে দেখেননি। প্রফেসর আবদুর রহমান বেঞ্চটা থেকে সামান্য দূরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দৃষ্টিটা ছেড়ে দিয়ে বসেছেন- এই দু'ঘন্টায় একবারও সেখান থেকে চোখ সরিয়ে নেননি। একনাগাড়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় তাঁর দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে এসেছিল। তবু তিনি চোখকে অবসর না দেয়ায় এখন টপটপ নোনা পানি ঝরছে চোখ থেকে।

পাশের একটা ঝোপে এসময় খিল খিল করে হেসে ওঠে একটা মেয়ে। ধ্যান ভেঙ্গে যায় আবদুর রহমানের। এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নেন তিনি। মেজাজটা খিঁচড়ে যায়। হ্যাঁ, এখানেই ছিল মসজিদটা। মনে পড়ে সেদিন আকাশে ছিল আধবাঁকা চাঁদ। তারা তরা আকাশ হাসছিল মিষ্টি মধুর। সন্ধ্যা উৎরে গেছে অনেক আগে। ব্যস্ত শহর ঢাকার মানুষ তখন গা এলিয়ে দিয়েছে বিছানায়। ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে তাদের দু'চোখ। এসময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল একদল তরুণ। তাদের চোখে ঘুম নেই। আছে শপথের অগ্নিশিখা।

সেদিন এখানে বাগান ছিলনা। ছিলনা নিকুঞ্জবন। এখানে তখন বিরান মাঠ। উত্তরে ঢাকা ক্লাব আর দক্ষিণে হাইকোর্টের দেয়াল ছিল সীমানা। টি এস, সিতে দাঁড়ালে দেখা যেত ইঞ্জিনিয়ার ইনষ্টিটিউটের ভবনের কঠিন পাথর। শত শত তরুণ চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়েছিল মাঠের বুকে। সন্তর্পনে কয়েকটি ট্রাক নেমে এসেছিল মাঠের ভেতর। ট্রাক বোঝাই ইট, বালু, সিমেন্ট। হাতে হাতে সেগুলো নেমে এলো নীচে। নেমে এলো সিমেন্ট, বালু, ইট। শুরু হলো কাজ। মুখে কারো শব্দ নেই। গভীর রাতের আবছা আলো আঁধারীতে কর্ম ব্যস্ত কতকগুলো হাত দ্রুত উঠলো নামলো। রাত বাড়ছে। কাজ চলছে দ্রুত। দেখতে দেখতে ভিত্তিপ্রস্তর গাড়া হয়ে গেল। ইটের সাথে ইট লাগিয়ে শুরু হলো দেয়াল দেয়ার পালা। আধ হাত, একহাত, দুই হাত, তিন হাত-দেখতে দেখতে দেয়াল উঠে গেল আরো উপরে।

আবার হেসে উঠলো মেয়েটি। প্রফেসর আবদুর রহমানের চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। তাকিয়ে দেখলেন যেখানে একদিন ছিল মসজিদের ভীত, সেখানেই উঠে দাঁড়িয়েছে অভিসার রত প্রেমিক জুটি। অক্ষম আক্রোশে উঠে দাঁড়ালেন আবদুর রহমানও। উঠতে গিয়েই টের

www.pathagar.com

পেলেন ঘামে নেয়ে উঠেছেন তিনি। জামা-কাপড় লেপ্টে গেছে গায়ের সাথে। এবার তিনি সরে এসে পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণের পার্কের বিশাল ছাতাটার নীচে আশ্রয় নিলেন।

বিষন্ন নির্জন দুপুর। পুকুরের দিকে মুখ করে বসলেন তিনি। দু'একটা গাড়ী এই নির্জনতা ভেদ করে পাশের রাস্তা ধরে তীব্র বেগে ছুটে গেল। সে সব গাড়ীর হুইসেলের বিকট শব্দে একেকবার চমকে ওঠেন প্রফেসর আবদুর রহমান। কাছেই একটা ইউকেলিপ্টাসের ডালে বসে এক নাগাড়ে ডেকে যাচ্ছে একটা কাক। আর কোন শব্দ নেই কোথাও। বসে বসে তিনি কাকের বিশ্রি ডাক শুনলেন দীর্ঘক্ষণ। কাকটারও যে কী হয়েছে- সেই কখন থেকে ডাকছে, যাবার নামটি নেই।

সূর্য এক সময় পশ্চিমে হেলে পড়ল। অফিস ফেরত লোকজন কেউ কেউ তাকে পাশ কেটে চলে গেল। হৈচৈ করতে করতে এক দল ছাত্র-ছাত্রী বাড়ী ফিরছিল। তাকে দেখেই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে সরে পড়লো। কিন্তু কোন দিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই আবদুর রহমানের। উদাস দু'চোখ এখন তার সুদূরে নিবদ্ধ। পার্কের সবুজ বৃক্ষ ভেদ করে তার দৃষ্টি টি, এস, সি'র লাল সাদা দেয়ালে ঘুরলো। রোদের উত্তাপে দৃষ্টি পথে লাল হলুদ অসংখ্য ফুল খেলা করলো। আস্তে আস্তে তার চোখ থেকে একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল সবুজ ঘাস, বৃক্ষ, দর দালান, ভার্সিটি মসজিদের মিনার, সব কিছু। তখন প্রফেসরের অবচেতন দৃষ্টিটা খুব প্রখর হয়ে উঠলো। আর সেই অবচেতন দৃষ্টি মেলে তিনি দেখলেন-টি, এস, সি'র ভেতর ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি করছে। ধর মার চিৎকার ভেসে আসছে সেখানে থেকে। ভেসে আসছে লাঠির ঠুকঠাক শব্দ। এক দল ছেলেকে পালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন কেউ। কিন্তু ছেলেরা যেতে রাজী হচ্ছে না। নেতা খুব গম্ভীরভাবে ধমকে উঠলেন এবার। আস্তে আস্তে ছেলেরা মাথা নীচু করে যে যে দিকে পারে দৌড় লাগালো। শেষ দলটির সাথে বেরিয়ে এলেন নেতাও। আবদুর রহমান দেখতে পাচ্ছেন, শেষ দলটা এদিকেই ছুটে আসছে। পেছনে হকিষ্টিক, লাঠি, রড হাতে করে ছুটে আসছে ষন্ডা মার্কা আরেক দল ছেলে। তিনি দেখলেন, ছুটতে ছুটতে ছেলেরা প্রায় তার কাছটিতে চলে এসেছে। মরিয়া হয়ে ছুটছে সবাই। হামলাকারীরা সামনের ছাত্র দলটিকে ধরে ফেললো বলে। তখন আবদুর রহমানের অবচেতন দৃষ্টি অবাক হয়ে দেখলো, সাথীদের পালাবার সুযোগ করে দেয়ার জন্য একটু একটু করে পেছনে সরে আসছেন নেতা। আবদুর রহমান দেখলেন, তার চোখের সামনেই হামলাকারীদের নাগালের মধ্যে পড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি। নির্মমভাবে তার উপর লাঠি চালালো গুন্ডারা। একজন তার বুকের উপর পা তুলে দাঁড়ালো। একজন মুখে লাথি চালাতে চালাতে বললোঃ "বল, আর ইসলামের নাম নিবি?" নেতা তখন বেহুঁশ। তার মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সবুজ

www.pathagar.com

ঘাস। আর একজন তরুন আবদুর রহমান নেতার অসাড় অবচেতন দেহটা পেছনে ফেলে তখনও দৌড়ুচ্ছে প্রাণপনে।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রফেসরের শরীর এখন বোধ শক্তিহীন। দৃষ্টি ঝাপসা। মাথায় এলোমেলো চিন্তার ঢেউ। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, আমার মত তারও আজ ঘর সংসার থাকতো। থাকতো প্রিয়তমা স্ত্রী। থাকতো সন্তান সন্ততি। আমাদের চাইতে ভাল চাকরীই করতে পারতেন তিনি। কারণ, তিনিই ছিলেন আমাদের মধ্যে সেরা ছাত্র। এ সব ভাবতে ভাবতে কি যে হলো তার। বাড়ী যাবার কথা একবারও মনে হলো না। মনে হলোনা বাচ্চারা তার পথ চেয়ে বসে থাকবে। মনে হলো না গভীর উৎকণ্ঠায় তার জন্য অপেক্ষা করবে এক প্রিয় রমনী।শুধু মনে হল, তার সেই সংগ্রামী নেতা, যিনি বলতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোর চাইতে সংগঠনের অফিস আমার কাছে অধিক প্রিয়, সেই নেতা আবারও এসে দাঁড়িয়েছেন তার সামনে। তেজোদৃপ্ত ভাষায় বলে চলছেনঃ ভাইয়েরা আমার, মনে রাখবেন, জেহাদী জিন্দেগী ছাড়া মুমীনের মুক্তির আর কোন পথ নেই। সংগ্রামের কঠোর ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আমাদের। পথহারা মানুষকে দিতে হবে পথের সন্ধান। তিলে তিলে যারা আজো এগিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের দিকে, ফেরাতে হবে তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে। হয় আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে আমাদের চেষ্টায়, আর না হয় শাহাদাতের আবে কাওসার পান করে হাসতে হাসতে আমরা পৌঁছে যাব জান্নাতের বাগিচায়। এই-ই আমাদের পথ। এই আমাদের ভাইদের রেখে যাওয়া ঐতিহ্য।

আবদুর রহমান উঠে দাঁড়ালেন। প্রত্যয় দীপ্ত আভা এখন তার চোখে মুখে। ঠিক করলেন, জোহরের নামাজ আদায় করবেন এখানেই- যেখানে একদিন শহীদের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মসজিদ। অজুর জন্য পুকুরের ঢালু বেয়ে নীচে নামতে শুরু করলেন তিনি। ঢালুতে পা দিয়েই টের পেলেন একটা নয়, দুটো নয় অসংখ্য ইট শুয়ে আছে ঘাসের নীচে। আস্তে আস্তে বসে পড়লেন তিনি। টেনে তুললেন একটা ভাঙ্গা ইট। গভীর আবেগে চেপে ধরলেন বুকে..... আর তখন পাহাড় বিদীর্ণ করে ঝরণার মত হু হু কান্নার ঢেউয়ে দুলে উঠলো তার শরীর। তার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়লো দৃপ্ত শপথঃ বাতিলের হিংস্র থাবায় ভেঙ্গে যাওয়া মসজিদের পবিত্র ইট ছুঁয়ে শপথ করছি, তোমার স্বপ্ন সফল না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই থামবো না, কিছুতেই না।

সেদিন থেকে প্রতি বছর নতুন ডাইরী কেনার পর একটি তারিখ লাল কালিতে দাগ দেয়ার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল প্রফেসর আবদুর রহমানের। তারিখটা উনিশ শো উনসত্তুরের পনরই আগষ্ট।

www.pathagar.com